সেরা রম্যরচনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

www.pathagar.com

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

সূচি

বই কেনা ২১

২৬ কাইরো
২৯ আহারাদি
৩২ 'কলচর'
৩৫ বর্ষা
৩৮ প্যারিস
৪১ 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'
৪৬ ভাষাতত্ত্ব
৪৯ দাম্পত্য জীবন
৫২ পঁচিশে বৈশাখ
৫৫ তোতা কাহিনী
৫৮ চরিত্র পরিচয়
৬০ আড্ডা
৬৯ পাণ্ডা
৭২ 'নেভা'র রাধা
৭৫ ফরাসি—জর্মন
৭৭ ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন
৮০ ঋতালী
৮৩ গাইড
৮৫ রসগোল্লা
৯৩ বাঙালি মেনু
৯৭ রন্ধন-যজ্ঞ

'বাঁশবনে—' ১০০
বাবুর শাহ ১০৫
মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা... ১০৮
'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'... ১১৫
চোখের জলের লেখক ১১৯
বিষ্ণুশর্মা ১২৩
এমেচার ভার্স্‌স স্পেশালিস্ট ১২৬
ভাষা ১৩০
রবি-পুরাণ ১৩৩
পুষ্পধনু ১৩৭
নস্‌রুদ্দীন খোজা (হোকা) ১৪০
ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ ১৪৯
গাঁজা ১৫৬
দশের মুখ খুদার তবল ১৬৩
রসিকতা ১৬৭
আড্ডা—পাসপরট্‌ ১৭২
কুট্টি ১৭৮
দরখাস্ত ১৮৫
বনে ভূত না মনে ভূত ১৮৯
চুম্বন ১৯২
খোশগল্প ১৯৯

www.pathagar.com

সেরা রম্যরচনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

সম্পাদনা

আবদুশ শাকুর

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৫০

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

চতুর্থ সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0249-x

An anthology of belles-lettres by Sayed Mujtaba Ali
Edited by Abdush Shakoor
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14, Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1000
Bangladesh. Cover Design : Dhrouba Esh. 4th Edition, 7th Print : October 2012
Price Tk. 275.00 only

www.pathagar.com

ভূমিকা

মুজতবা আলীর রম্যরচনা পাঠকসমাজের সর্বসম্মত আদৃতি আদায় করার পরেও জনাদৃত এই লেখকের প্রতি সারস্বত সমাজের একটা তূষ্ণীম্ভাব লক্ষ করা যায়। এ কি জনপ্রিয়তার সঙ্গে ন্যূনতার নিহিত সম্পর্কটির কারণে? যে-কারণেই হোক, বুধগণের মূল্যায়নে মনে হবে মুজতবা একজন 'রম্য লেখক'মাত্র। না কি তাঁরাও মুজতবার রচনার রম্যতায় এতই মোহিত যে সৈয়দীয় রচনার বাকি গুণাবলীর মূল্য নিরূপণের ক্ষমতাই তাঁদের তিরোহিত? বিষয়টা দুর্জ্ঞেয়। অবশ্য পণ্ডিতমণ্ডলী নিজেরাও কিছুটা রহস্যমণ্ডিতই থাকেন অনেকসময়। আমি পণ্ডিত নই বিধায় যথাযথ কথায় সরাসরি শৈলীতে প্রথমেই বলে ফেলতে চাই যে সৈয়দ মুজতবা আলী 'রম্য লেখক'মাত্র নন। তিনি একজন এসেয়িস্ট কিংবা 'রচনাসাহিত্যিক'। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় 'অন্তরঙ্গ রচনাসাহিত্যিক' হিসেবে বাংলা ভাষায় তিনি অনন্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, উদ্‌যাপিত সমালোচনা-সাহিত্যিক, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯২-১৯৭০) বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : আধুনিক যুগ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে এবং তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, লেখকের মৃত্যুর তিন বছর আগে। মুজতবা-নামটি এর নির্ঘণ্টেই নেই। তিনি আলোচনা শেষ করে দিয়েছেন বিশ শতকের চল্লিশের দশকেই। তার মানে অধ্যাপকের মতে পঞ্চাশের এবং ষাটের দশক দুটিতে নতুন কিছুই বিকশিত হয়নি বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিক' যুগে। আমার মন্তব্য মুখিয়ে উঠতে চায় বইটির ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত প্রমথ চৌধুরীর রচনার গঠনগত বৈশিষ্ট্য 'যদৃচ্ছাচরণ' এবং অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য 'বৈঠকী মেজাজ' প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলি থেকে। এই রীতিগুলোকে আরেক স্তরে উন্নীত করে মুজতবা, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচিত, চল্লিশের দশক শেষ হবার আগেই প্রমথীয় নতুন ধারার সঙ্গে সৈয়দীয় নতুন ধারা যোজন করেছেন—যেটা ছিল, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের শব্দবন্ধে, মঁতেইনীয়

www.pathagar.com

'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী', যেখানে প্রমথ প্রমাণিত হয়েছেন প্রধানত বেকনীয় হৃদয়নিরপেক্ষ 'মস্তিষ্ক-সংবাদী'।

প্রমথ বৈঠকী ও মগজমন্থী। মুজতবা বৈঠকী ও মর্মস্পর্শী। প্রমথকে হৃদয়বর্জিত-মস্তিষ্কসর্বস্বও বলা যায় (যে-সত্যটি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তাঁর ভঙ্গিতে—তোমার রচনায় *ঠা-ঠা* রোদ্দুর, আমার পছন্দ আলো-আঁধারি)। এই আলো-আঁধারির ভাণ্ডারী মুজতবা আলী সম্পূর্ণ নতুন বর্ণ, গন্ধ ও 'সোয়াদে'র 'অন্তরঙ্গ রচনাসাহিত্য' সংযোজন করেছেন বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় প্রথম তিনিই মঁতেইনের মতো বলতে পারতেন—'আই স্পিক আন্‌টু পেপার অ্যাজ আন্‌টু দ্য ফার্স্ট ম্যান'। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম 'মাস্টার অব দ্য আর্ট অব টকিং অন পেপার', জন গ্রসের ভাষায়। এসবের সুবাদেই মহাবাগ্মী মুজতবা আলীর অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠ বাঙলার শ্রোতামাত্রেরই সর্ব অঙ্গ কর্ণ করে তুলেছিল। বঙ্গের কথাসাহিত্যে এ-বিপ্লবটি মাত্র চারটি বছরের পরিসরেই ঘটে গিয়েছিল, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালে—যে-সময়ের মধ্যে তাঁর প্রধান বইগুলো বেরিয়ে গিয়েছিল *(দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য)*। দ্রুতবর্ধিষ্ণু বিলোড়ন সৃষ্টিকারী 'দেশে বিদেশে' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার উনিশ বছর পরও বাংলা সাহিত্যের তুখোড় অধ্যাপকের অগোচর থাকতে পারেন না মুজতবা আলী। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ১৯৬৭ সালের সংস্করণটিতে অবশ্যই উল্লেখ করতেন 'খেয়ালী লেখায় নতুন যাত্রীর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, বৈঠকী চালের এই উত্তরণটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি'—যদি তিনি মুজতবা আলীকে নোটিসে নিতেন। হতে পারে, 'রম্যলেখকে'র প্রতি অন্তর্নিহিত অশ্রদ্ধাবশতই উপেক্ষিত হয়েছেন বেচারি। ফলে বাংলা সাহিত্যের উচ্চতর শিক্ষার বিদ্যার্থীগণ তাঁদের পূজ্যপাদ অধ্যাপকের কাছ থেকে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক একটি ভুল সিগনেল পেয়েছেন—বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ নূতন একজন রচনাসাহিত্যিক সম্পর্কে।

আরেক মহাপণ্ডিতের একটি নির্মল মন্তব্যও মুজতবা আলীর জন্য নির্মম বলেই গণ্য। ভাষা-আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) নাকি বলেছেন মুজতবা আলী তাঁর প্রতিভার যোগ্য কোনো কাজ রেখে যাননি। হতে পারে, মহাপণ্ডিতের এবংবিধ মন্তব্য পরোক্ষে মুজতবাকে বড় পণ্ডিত বলেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু, অনভিপ্রেত হলেও, এ-ধরনের কথা তো তাঁর রেখে যাওয়া কাজের মূল্য হ্রাসও করে ফেলে। এক আচার্য হতে পারেন মহাপণ্ডিত, আরেক আচার্য রসপণ্ডিত। তাই মহাপ্রতিভাধর হয়েও দুজনে কাজ রেখে যেতে পারেন দুধরনের। কারণ একজন কারিগর তো আরেকজন শিল্পী। চিন্তনশীল উৎপাদন করেন জ্ঞান। সৃজনশীল পরিবেশন করেন রস। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বলতে চাই রসবস্তু সৃজনই মুজতবা আলীর যোগ্য কাজ। তাঁর গুরু রবীন্দ্রনাথও নিজেকে রসের কারবারি-ই বলেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু জাতীয় অধ্যাপক শ্রীচট্টোপাধ্যায় কথাটা বলেছেন কোথায়? কথায়, না লেখায়? জানি না। আমি পড়েছি অন্য কারো লেখায়। কোথায়? কার লেখায়? তাও আর মনে নেই। তেমনি, পহুঁচা-হুয়া পীরের মতো প্রভাববিস্তারী এবং প্রজন্ম পরম্পরায় ইয়াং-টার্কদের মুর্শিদ, বুদ্ধদেব বসুও নাকি বলেছেন—যিনি কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু লিখতে পারেন না, তিনিই লেখেন 'রম্যরচনা' (মানে যেটা 'বিশেষ' কিছু নয়)। এমন শ্রদ্ধেয় একজন লেখকের এমন অশ্রদ্ধেয় একটি বাক্যের জেনেসিসও আমি জানি না, যদিও আমি নিজেই পড়েছি কারো লেখায় কোথাও। তবে জেনেও আর কাজ নেই। কারণ কাজ-অকাজ যা হবার তা তো হয়েই গেছে—এক্ষেত্রে তা রচনাসাহিত্যিকের তলপেটে আঘাত; এমনকি মুজতবা আলীর মতো অভূতপূর্ব অন্তরঙ্গ রচনাশিল্পীটিরও। এভাবেই সৃষ্টি হয় 'ক্লাইমেট অব ওপিনিয়ন', অভিমতের আবহাওয়া—যা একজন লেখকের ওজন নিরূপণে, তথা মূল্য নির্ধারণে, বড় ভূমিকা পালন করে থাকে।

বুদ্ধদেব কথাটা বলে থাকতে পারেন, রম্যরচনা-নামক অমনিবাস শব্দবন্ধটির অন্তর্নিহিত রসাপ্লুত চাঁদোয়াতলে সর্বরকমের রগুড়ে-খেলুড়ে-ইতর-চতুর আমুদে 'রচনা'র আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন দেখে। তাঁর মতো মেধাবী অধ্যাপক একটু গভীরে গেলেই দেখতে পেতেন যে এর কারণ ছিল গদ্যশিল্পের বর্গীকরণ বিষয়ে সৃষ্ট বিশেষ বিভ্রান্তি। লিখিত গদ্য আর শিল্পিত গদ্য, রচনাসাহিত্য আর রম্যসাহিত্য—সব একাকার করে 'রম্য রচনা' লেবেল এঁটে সস্তা-বস্তায় পুরে দিয়ে বাজারে ছাড়াটাই হু হু করে বিভ্রান্তিটি ছড়ায়। এইভাবেই মুজতবা আলীর সৃজিত অননুকরণীয় 'রচনাসাহিত্য'ও লেবেল পেয়ে যায় 'রম্যরচনা'র। এই জায়গাটাই আমার 'পয়েন্ট অব ডিপার্চার'—উপস্থিত আলোচ্যের উদ্দেশে প্রস্থানের বিদায়-বিন্দু।

বাংলা 'নন্‌ফিকশনাল প্রোজ' কিংবা নকাল্পনিক গদ্যসাহিত্যের যে *genre* বা সংরূপটিকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বলা হয়, সেটি ব্যক্তিগত বটে তবে প্রবন্ধ নয়; রচনা। ওই ফর্ম অথবা রকমটিকে ব্যক্তিগত রচনা বলারও দরকার হয় না, ওটা শুধুই রচনা। লেখকের নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে অনির্দিষ্ট বিষয়ে মনোহরণ স্বগতকথনের জন্যই *treatise* কিংবা প্রবন্ধ থেকে সৃষ্ট হয়েছে essay অথবা রচনা-নামক সম্মোহনী গদ্যরীতিটি। এটি সৃষ্টি করেছেন ফ্রান্সের মিশেল মঁতেইন (১৫৩৩-৯২) এবং নাম দিয়েছেন *essai* এসে—প্রয়াস অর্থে, প্রতিপাদ্য-নয় অর্থে। শব্দটির সমার্থ বাংলা প্রতিশব্দ হল রচনা। যে-অর্থে রমণী করেন নিত্য তাঁর কবরীরচনা, পদ্যকার করেন কাল্পনিক তাঁর কাব্যরচনা—সে-অর্থেই গদ্যকার করেন নকাল্পনিক তাঁর সাহিত্যরচনা। সে-সাহিত্য যখন বিশেষ একটি সৃষ্টি কিংবা নির্মিতির রূপ পায়—তখনই সে হয়ে ওঠে রচনাসাহিত্য। গদ্যশিল্পের এ এক স্বতন্ত্র ঘরানা। প্রকারটিতে সৃজনধর্মী গদ্যশিল্পীর চিত্তবৃত্তি বিকাশের

www.pathagar.com

প্রয়াস থাকে—নানা ভাবের পরিসাজে, চিত্রবিচিত্র মেজাজে। লেখকের ব্যক্তিতাব্যঞ্জিত এই সব সাজ-মেজাজই রচনার অন্তরঙ্গে সৌকুমার্যের একটা ফল্গুধারা বইয়ে চলে।

ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে উনবিংশ শতক জুড়ে একদিকে হ্যাজলিট-আর্নল্ড-গোতিয়ে-ফ্রঁসদের প্রভাবে সাহিত্যিক সমীক্ষা, পুস্তক পর্যালোচনা ইত্যাদি ভারি উপজীব্য নিয়ে ব্যস্ত 'এসে' পুনরায় ট্রিটিজ কিংবা প্রবন্ধধর্মী তথ্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে ক্লান্তিকর হয়ে উঠলে এবং আরেকদিকে সাংবাদিক স্তম্ভকারের বস্তুধর্মী বয়ানের তারল্যে পানসে হয়ে পড়লে—রচনাসাহিত্যের নানারকম শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটে, বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দশকে। এই প্রক্রিয়ায় *familiar essay* বা 'অন্তরঙ্গ রচনা'-নামক 'দিভের্তিস্‌মঁও' অথবা এন্টার্টেনমেন্ট-ধর্মী একটি রচনারীতি জনপ্রিয় হয়। স্যাঁৎ-ব্যভ্ (১৮০৪-৬৯)-এর 'কোজ্‌রি' কিংবা 'বিশ্রম্ভালাপ' *Couseries du lundi (Monday Chat)* অনুসরণে এমিল্ ওগ্যুস্ত্ শাতিয়ে (১৮৬৮-১৯৫১) তাঁর *Propos* অথবা 'আলাপ' 'প্রপো দ্য লিতেরাত্যুর' প্রকাশ করেন। সমসময়ে হ্যারল্ড নিকলসন লেখেন মঁতেইনীয় আমেজের 'স্মল টক', ম্যাক্স বিয়ারবম লেখেন 'অ্যান্ড ইভেন নাউ', ইলেয়ার বেলক লেখেন 'অন নাথিং'। ইঙ্গ-ফরাসি এই অন্তরঙ্গ আমেজের রচনারীতিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বঙ্গদেশে শিকড় গেড়েছিল অসাধারণ রচনাসাহিত্যিক, 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' মুজতবা আলীর উর্বর উদ্যানে। এ-ও এক জাতের সুরভিত গোলাপই ছিল, যদিও সে আজ জংলি গোলাপের উৎপাতে নিরস্তিত্ব—যোগ্য উত্তরসূরির লালনের অভাবে। তিনি, মতান্তরে দিলীপকুমার রায়, নাকি এটাকে 'মঞ্জুভাষণ' বলতেন। ভাষণ ঠিকই, তবে মঞ্জু নয় ; যেহেতু মঞ্জিমা রচনাসাহিত্যের অন্তর্জাত গুণ। তাই রচনার বিশেষণরূপে বহুল প্রচলিত রম্য-শব্দটিও আসলে অতিশয়োক্তি। অর্থাৎ 'রম্যরচনা' একটি দুষ্ট, এবং সে-কারণে পরিহার্য, শব্দবন্ধ। এ ধরনের রচনার নামটা তাই 'রম্যরচনা'র বদলে 'ফ্যামিলিয়ার এসে'র ভাবার্থব্যঞ্জক 'অন্তরঙ্গরচনা' রাখাই সমীচীন হত। তবে রম্যতা গল্পের সহজাত গুণ নয় বলে, গল্পের বিশেষণরূপে রম্য-শব্দটি চলতেই পারে এবং 'রম্যগল্প'-নামক প্রশংসনীয় একটি উপসংরূপ বাংলা সাহিত্যে আছেও। সরসগল্পও বলা হয় ওটাকে। তবে না-বলাই ভালো, যেহেতু অন্য গল্পকে নীরস ভাবা যায় না। এই রম্যগল্পসহ যাবতীয় রঙ্গরচনার সঙ্গে 'অন্তরঙ্গরচনা'কেও 'রম্যরচনা' বলে ঢালাও একটি অসঙ্গত নামে বর্গীকরণ অত্যন্ত ক্ষতিকর সংজ্ঞাবিভ্রমের সৃষ্টি করেছে।

বলা হয়, 'রম্যরচনা' নাকি 'বেল্-লেত্‌র'র বাংলা। অথচ প্রামাণিক অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ 'লারুস্ গ্র্যান্ড ডিকশনারি' *Belles-lettres* শব্দবন্ধটির অর্থ লেখে *great literature*। প্রামাণ্য অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ অভিধান ক্যাসেল্'স্ লেখে—ওটির ইংরেজি অর্থ 'পোলাইট লিটারেচার' এবং চারুচন্দ্র গুহের প্রামাণিক অ্যাংলো-বেঙ্গলি

www.pathagar.com

ডিকশনারি লেখে—শব্দবন্ধটির বাংলা অর্থ 'সুকুমার সাহিত্য'। এরই একটি জঁর বা সংরূপ রচনাসাহিত্য। আবার তারই একটি উপসংরূপ 'অন্তরঙ্গরচনা'। এবার শব্দ-দুটির অর্থ আলাদা করে দেখা যাক। বহুবচন *belles* শব্দটি বহুবচন *beaux* শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ, যার অর্থ সুকুমার। যেমন *beaux-arts,* যার অর্থ ফাইন আর্টস বা সুকুমার শিল্প। *belles* শব্দটির নিকটতম প্রতিশব্দগুলো হবে—ইংরেজিতে পোলাইট অথবা এলিগ্যান্ট আর বাংলায় সুকুমার অথবা রোচিষ্ণু। *lettres* শব্দটিও বহুবচন, যার অর্থ হিউম্যানিটিজ কিংবা লিটারেচার—রচনা নয়। সুতরাং *belles-lettres* শব্দবন্ধের বাংলা পরিভাষা হবে 'রোচিষ্ণু সাহিত্য' কিংবা 'সুকুমার সাহিত্য'—'রম্যরচনা' হওয়ার কোনো হেতু নেই। অতএব ব্যঞ্জনা-ইঙ্গিতের বিচারে *belles* শব্দটির প্রতিশব্দরূপে 'রম্য' শব্দটি শুধু অচলই নয়, বিভ্রান্তিকরও। রম্যরচনা-নামক অমনিবাস শব্দবন্ধটির অন্তর্নিহিত ভ্রান্ত সংজ্ঞার প্ররোচনাতেই, যতসম্ভব মুখরোচক করে তোলার জন্যে, নামটির রঙ্গরসিক ছত্রছায়ায় জমে চলেছে লাগামহীন ইয়ার্কির মাজমা। তবে প্রসঙ্গত এ-ও স্মর্তব্য যে সাধারণভাবেই বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবিশ্বে রচনাসাহিত্যের যেন পুনর্জন্মই হয়েছে চটুলসাহিত্যরূপে। অন্তত জেমস থার্বার, ডরথি পার্কারদের পড়লে তেমনি মনে হয়। তবু ভুললে চলবে না যে সমসাময়িক রেনার ব্যানাম (১৯২২-৮৮), জন আপডাইক (১৯৩২-), যোসেফ এপস্টিন (১৯৩৭-) প্রমুখ—চটুল নয়, অন্তরঙ্গরচনাই লিখেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত রামতনু অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত, তাঁর 'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক [রচনা-সাহিত্য]' (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৪, ষষ্ঠ সং, ১৯৯৩)-নামক গ্রন্থে বলেন :

> *Essay* 'অর্থে আমরা বাঙলায় রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি কতকগুলি নাম তাহাদের নিজস্ব অর্থবৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু নাম ব্যবহারের এই অসতর্কতা আমাদের অনেক ভুল ধারণার মূলীভূত কারণ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বেকন আমাদের এই ভাষা ব্যবহারের শিথিলতাকে *Idol of the Market* বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জগতের বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তির মূলে রহিয়াছে ভাষা প্রয়োগের ভুল।' (পৃ ১৬-১৭)।
>
> 'বাংলায় ইংরেজি *Essay* শব্দের প্রতিশব্দরূপে যে কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে তাহার ভিতর রচনা শব্দের প্রয়োগকেই আমরা সুষ্ঠুতম বলিয়া বিবেচনা করি। এইজন্যই আমরা আমাদের আলোচনায় ইচ্ছাপূর্বক রচনা কথাটি ব্যবহার করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, নাটক, গল্প, উপন্যাস ব্যতীত সকল গদ্য লেখাই সাহিত্য নহে,—সাহিত্য একরূপ বিশেষ লেখা—সেই বিশেষত্বমণ্ডিত গদ্য লেখাকেই রচনা নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের রচনা শব্দটিকে বাছিয়া লইবার কারণ এই,—সাহিত্য—সে যে প্রকারেরই হোক না কেন—একটা সৃষ্টি বা নির্মিতি; কোন সৃষ্ট-ব্যাপার না হইলে কোন লেখাই কখনও সাহিত্য-পদবাচ্য

www.pathagar.com

হইতে পারে না। রচনা শব্দটির ভিতরে একটা সৃষ্টির কথা অনুস্যূত হইয়া আছে; রচনা বলিয়া সাহিত্যের শ্রেণীটির ভিতরেও যে একটা অসাধারণ চমৎকারিণী নির্মিতি রহিয়াছে, ঐ শব্দটির ভিতরেই তাহার বেশ একটা ইঙ্গিত আছে। এইখানেই আমরা প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং রচনা-সাহিত্যের ভিতরে একটা ভেদরেখা টানিতে চাই। প্রবন্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টি নহে, রচনা সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইংরেজি *Essay* এবং *Treatise, Discourse, Dissertation* শব্দের ভিতরে যে তফাত, রচনা এবং প্রবন্ধের ভিতরে আমরা সেই তফাত কল্পনা করিতে পারি। অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধ এবং রচনা আমাদের সাহিত্যে প্রায় সমার্থক শব্দরূপেই প্রচলিত, সুতরাং তাহাদের ভিতরে যে পার্থক্যের কথা এখানে বলিতেছি তাহা ঐতিহাসিক নহে,—তাহা অনেকখানিই অর্থগত। তবে এই অর্থগত ভেদকে অবলম্বন করিয়া আমরা প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরকার এই প্রভেদকে যদি এখন হইতে মানিয়া লই, তাহা হইলে একটি সাহিত্যিক শ্রেণী হিসাবে রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং পরিধি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।' (পৃ ২৪-২৫)।

ট্রিটিজ এবং এসে'র প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরকার উক্ত প্রভেদটি মানা হচ্ছে না আজ ছয় দশক পরেও। প্রমাণ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত (১৯৯৯) 'সাহিত্যের শব্দার্থকোষ'-এ লেখা আছে সন্দর্ভ অর্থ *essay* (পৃ ১০৭)। বস্তুত সমস্যাটা কী? *essay*-কে রচনা বললে, কারো 'রচনাবলী'তে সবই *essay*-র সমাহার বোঝাবে? ওগুলিকে না-হয় গ্রন্থাবলীই বললাম—রচনাবলীর অনেকখানি তো এমনিতেও গ্রন্থনাবলী। ইংরেজি-ফারসি সাহিত্যে তো বিরাট-বিশাল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গ্রন্থাবলীর নামও ছিল *essay* (যেমন *Blaise pascal*-এর *Essai pour les coniques (1640)* কিংবা *John Locke-এর essay Concerning Human Understanding (1689)*—সম্ভবত এই বিনীত অর্থে যে, তাঁদের এই এসে' বিশাল একটি বিষয়ে প্রবেশের একটা প্রয়াস বা উদ্যোগমাত্র। ঢাউস সেইসব প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর পাশ কাটিয়ে কিউট-বিউটি কিংবা সুতন্বী চমৎকৃতির চিত্তাকর্ষক এই এসে-শীর্ষক নির্মিতিটির, 'ননফিকশনাল প্রোজ'-এর নতুন জঁর হিসেবে, যথাসময়ে নিজের সুনির্দিষ্ট স্থানটুকু করে নিতে কোনো অসুবিধে তো হয়নি। আসলে যথাযথ হবার প্রবণতাই আমাদের নেই—যা উন্নত ভাষাভাষীর থাকে। তার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। ইংরেজদের ভাষায়, উদ্ভূত প্রয়োজনহেতু *Treatise* কিংবা প্রবন্ধ-শব্দটি প্রচলনে এসেছে ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে *(র‍্যান্ডমহাউস আনঅ্যাব্রিজড ডিকশনারি)*। ১৫৯৭ সালে, বেকনের হাতে, নকাল্পনিক গদ্যে *essay*-নামক আরেকটি ধরনের সৃষ্টি হতেই সেটি প্রচলনে চলে আসে ১৬০০ থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। প্রচলিত ট্রিটিজ-শব্দটি দিয়ে নবাগত এসে'কে দশটি বছরও চালাতে চেষ্টা করল না ইংরেজি সাহিত্যের কেউ (যা আমরা আজ দেড়শ বছর ধরে করে যাচ্ছি—মানে রচনাকে প্রবন্ধই বলে

www.pathagar.com

বেড়াচ্ছি)। আবার নতুন প্রয়োজন উদ্ভূত হতেই, সন্দর্ভ বোঝানোর জন্য সমধর্মী আরেকটি ইংরেজি শব্দ *Dissertation* প্রচলনে চলে এল ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ সালে, যার মধ্যে 'সংগ্রহে'র ভাবটা *Treatise* থেকে বেশি। প্রতিপক্ষে আমাদের অভিধানগুলো আজো পর্যন্ত—প্রবন্ধ, রচনা, সন্দর্ভ—এই তিনটি পরিভাষাকেই পরস্পরে বিনিময় বলে বিধান দিয়ে যাচ্ছে এবং তাতেই বিভ্রান্তিটি মান্যতাও পাচ্ছে সর্বসম্মত।

ঠিক কী প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে রচনা? প্রথমত, অবদ্ধ থাকার জন্য, যেহেতু প্রবন্ধ সংজ্ঞামতেই বদ্ধ। দ্বিতীয়ত, লঘুপক্ষ হবার জন্য, যেহেতু প্রবন্ধ গুরুভার। তৃতীয়ত, অপূর্ণ থাকার স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য, যেহেতু যত ক্ষীণই হোক প্রবন্ধকে তার সম্পূর্ণ রূপটি পেতেই হবে। পূর্বাপরসঙ্গতিসম্পন্ন যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা বদ্ধ রচনারই প্রতিশ্রুতি দেয় প্রবন্ধ—যা প্রকৃতই পরম্পরান্বিতরূপে সুসংবদ্ধ। উদাহরণ : আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের প্রবন্ধনিচয়। প্রতিপক্ষে, রচনা ধারণা জাগায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করার। এমনকি ফিরে আসার সুপথ খুঁজে নেবার প্রতিভা থাকলে, অবান্তর বিষয়গামী হয়ে রোমাঞ্চকর পুলকও উপহার দিতে পারে সে পাঠককে—যেমন চার্লস ল্যামের এলিয়া-নামে লেখা এসেগুলি, প্রমথ চৌধুরীর বীরবলীয় এবং রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক এবং মুজতবা আলীর পঞ্চতান্ত্রিক রচনাসমূহ। কোনো অধিশ্রয়িত বিষয়ে রচিত প্রসারিত-প্রবন্ধকে ট্রিটিজ না-বলে ডিসার্টেশন বলে—যেটা তত্ত্বালোচনামূলক গবেষণাঋদ্ধ ও সংগ্রহসমৃদ্ধ। আমরাও সেটাকে প্রবন্ধ না-বলে সন্দর্ভ বলতে পারি, যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প'। এছাড়াও আছে ডিসকর্স, লেকচার অর্থাৎ বক্তৃতা, ভাষা—যেমন রবীন্দ্রনাথের 'হিবার্ট লেকচার্স'।

সাধারণত বাংলভাষার বেশির ভাগ শব্দকোষেই দেখা যায়—অর্থের সূক্ষ্ম ভেদবিচার করে সঠিক ব্যঞ্জনা প্রকাশক যথার্থ প্রতিশব্দটি তালাশ করার বদলে তার মহল্লার সকল শব্দকেই ধরে এনে জড়ো করা হয়। সম্যক রোগনিদান করার বদলে প্রশস্ত-পরিধির বীজাণুপ্রতিরোধকের বিধান দান করার সস্তা ব্যবস্থা আর কি। ফলে বাংলা শব্দকোষে বিদেশি শব্দটির ভাবানুবাদ মিললেও, প্রতিশব্দ মেলে না। তার জন্য বাংলাভাষা ব্যবহর্তার অভিব্যক্তি, ব্যাহত তো বটেই, বিকৃতও হয়। অভিপ্রায়ের ভাষাও হয়ে যায় ঝাপসা। অভিধানগুলোতে ইংরেজি ট্রিটিজ, ডিসার্টেশন এবং এসে, এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটির বিপরীতে অর্থরূপে বাঙলা তিনটি শব্দই দান করে দেন আত্যন্তিক উদারচেতা আভিধানিকগণ—রচনা, প্রবন্ধ, সন্দর্ভ। অথচ আমরা দেখেছি ট্রিটিজ শুধু গবেষণামূলকও হতে পারে, ডিসার্টেশনকে হতে হয় বর্ধিত কলেবরে তত্ত্বালোচনাসমর্থিত এবং সংগ্রহসমৃদ্ধ। প্রতিপক্ষে এসে গবেষণার দায়িত্বভারাক্রান্তই নয় এবং এসেয়িস্টও

www.pathagar.com

গবেষণার অঙ্গীকারবদ্ধ নন বিলকুল। তিনি সাধারণত সমাজদর্শনের স্বল্পপরিসরের টীকাকার, ভাষ্যকার, সমালোচক এবং মানুষের আচার-ব্যবহার-পরিবেশ-পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষক রূপকার—যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৈয়দ মুজতবা আলী। যে-কোনো সাহিত্যিক রেওয়াজ থেকে রচনাকার এতই মুক্ত যে, ব্যক্তি-কি-ঘটনাবিশেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি মজার সংলাপ জুড়ে দিতে পারেন, চুটকি গল্পও ফাঁদতে পারেন। এমনকি গল্প-উপন্যাসকারের মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রও সৃষ্টি করতে পারেন তিনি—যেমন অ্যাডিসনের স্পেক্টেটার-পেপার্সের অমর চরিত্র স্যার রজার ডি কাভার্লি।

স্বাধীনতা আর সৌকুমার্যের মাত্রা যুক্ত হওয়াতে এসে বা রচনাসাহিত্যকে আমি বরং 'কল্পনাগৌণ' বলব—প্রবন্ধকে 'নকাল্পনিক' কিংবা নন্‌ফিকশনাল আর গল্প-উপন্যাসকে 'কল্পনাপ্রধান' বা ফিকশনাল বলার মতো। একই কারণে মুজতবা আলীকে আমি রচনাকার বলব, নাট্যকার-গল্পকারের মতো—সাহিত্যিক বললেও রচনাসাহিত্যিকই বলব এবং একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে সংজ্ঞামতে রচনাসাহিত্যিককেই রূঢ়িক 'কথাসাহিত্যিক' বলতে হয়। মঁতেইনের বাণীটি স্মরণ করুন 'আই স্পিক আন্‌টু পেপার অ্যাজ আন্‌টু দ্য ফার্স্‌ট ম্যান'। আরও তুলে আনুন রচনাকার সম্পর্কে জন্ গ্রসের মন্তব্যটি, 'মাস্টার অব দ্য আর্ট অব টকিং অন্ পেপার'। এই 'মাস্টার'ই বলতে হয় সৈয়দ মুজতবা আলীকে। অর্থাৎ তিনি খাস কথাসাহিত্যিক কিংবা রচনাসাহিত্যিক, আম রম্যলেখক নন।

মঁতেইন কর্তৃক প্রবর্তিত *genre* 'এসে'র শাব্দিক অর্থই হল পূর্ণতার প্রতিশ্রুতিহীন উদ্যোগ—যা লেখার মুহূর্তে বক্ষ্যমাণ বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত লেখকের মনের ছবি আঁকার প্রয়াসমাত্র। এই স্বয়ম্ভর প্রয়াসটিকেই আমরা বলছি একটি নতুন সংরূপ, পরিভাষায় যার নাম রচনা। সংরূপটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণটি, বেকনের নিজের এসে সম্পর্কে-করা, একটি উক্তিতেই মূর্ত হয়ে ওঠে : রচনা হল লবণের দানা, যা ভোগে উদ্বুদ্ধ করবে—ভোগক্লান্তির সৃষ্টি করবে না। রচনা বা 'এসে'-নামক নবসৃষ্ট এই ফর্মটির কালজয়ী আদৃতির কারণ হল—এ রচনা সাবজেক্টিভ, অমর্ত্য সেনের পরিভাষায়, বক্তাসাপেক্ষ—লেখকের মনের রঙে রঞ্জিত এবং মোহন মেজাজে মণ্ডিত। বাংলাভাষায় শৈলীটির সর্বশেষ মহান রূপকার সৈয়দ মুজতবা আলী।

ব্যক্তিতাব্যঞ্জিত প্রসাদগুণ নিয়ে মঁতেইনের *essai* প্রকাশিত হয় ১৫৮০ সালে। পরিভাষাটি ধার করে বেকন (১৫৬১-১৫২৬) তাঁর *essay* প্রকাশ করলেন ১৫৯৭ সালে। তবে বেকন গুরুর কাছ থেকে 'মন্ময় রচনা'র আদর্শটুকু ধার করেননি। তিনি লিখলেন বক্তানিরপেক্ষ দৃক্‌কোণ থেকে 'তন্ময় রচনা'। মন্ময় রচনাকারকে পাঠকের উদ্দেশে নিজের মনপ্রাণ উজাড় করে দিতে হয়, যেমন দিয়ে থাকেন মঁতেইন এবং তাঁর অনুসারী মুজতবা আলী প্রমুখ। তাই জন ফ্রিম্যান বলেন—

www.pathagar.com

রচনাকার হিসাবে বেকন নেহাতই মাইজার, বখিল। এজন্যেই ইংলিশ এসে'র পিতা হয়েও তিনি রয়ে গেলেন নিঃসন্তান, তাঁর এসে'র কোনো উত্তরপুরুষ মিলল না—তবে রইলেন অনতিক্রান্তই।

ওদিকে ফরাসি এসে'র, তথা এসে'রই, পিতা মঁতেইনও সন্ততিহীন রইলেন স্বদেশে। তবে ইংল্যান্ডে প্রায় শত বর্ষের প্রস্তুতিশেষে মঁতেইনের বংশ বাড়ল ইংরেজি সাহিত্যে এবং এর প্রভাববলয়ে, যেমন বাংলা সাহিত্যে। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদই পেয়ে গেল ইংরেজি সাহিত্যে মঁতেইনীয় ঘরানার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি চার্লস ল্যাম্‌কে (১৭৭৫-১৮৩৪)। শতকটির প্রায় প্রথমার্ধ জুড়ে তাঁর এবং উইলিয়াম হ্যাজলিট (১৭৭৮-১৮৩০)। জেম্‌স লী হান্ট (১৭৮৪-১৮৫৯), টমাস ডি কুইন্সি (১৭৮৫-১৮৫৯) প্রমুখ রচনাকারদের প্রাধান্য ছিল গল্প-উপন্যাসকারের তুলনায় অনেক বেশি। ইংলিশ এসেয়িস্টদের ওই ঝলমলে দলটির প্রভাবে ইংলিশ কলোনি বাংলার গদ্যও যাত্রাশুরুতেই পেয়ে গেল তার রচনাসাহিত্য এবং দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), রাজনারায়ণ (১৮২৬-৯৯), সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) প্রমুখের মুগ্ধ মনোযোগে পুষ্ট হয়ে সমৃদ্ধিও অর্জন করল অপ্রত্যাশিত। একই শতকের শেষ পাদে ইংরেজি রচনাসাহিত্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হল রবার্ট স্টিভেন্সন (১৮৫০-৯৪), ইলেয়ার বেলক (১৮৭০-১৯৫৪), ম্যাক্স বিয়ারবোম (১৮৭২-১৯৫৬), জি. কে. চেস্টার্টন (১৮৭৪-১৯৩৬), রবার্ট লিন্ড (১৮৭৯-১৯৪৯) প্রমুখের কলমে—বিষয় থেকে ঝোঁকটা গেল রীতির দিকে। পরিবর্তনটি বাংলা রচনাতেও বিংশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই লক্ষ করা যায়—বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), এবং মুজতবা আলীর (১৯০৪-১৯৭৪) রচনায়। তবে বিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও সাবজেক্‌টিভ কিংবা মন্ময় রচনাকার আর অবজেক্‌টিভ অথবা তন্ময় রচনাকারকে আলাদা করা মুশকিল এজন্যে যে তাঁদের অনেকে দুই দলেই থাকেন। বস্তুত এসে বা রচনা-নামক কল্পনাগৌণ এই অভিনব ফর্মটি বাংলা গদ্যভাষায় উপাদেয় ও চমকপ্রদরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রায় সকল বিষয়কেই তার আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে—এমনকি উপন্যাসের একটা অধ্যায় অথবা আস্ত একটা ছোটগল্পকেও। এর উত্তম উদাহরণ সৈয়দ মুজতবা আলী।

এককালে 'প্রবন্ধ' বলা হত সঙ্গীতকে তো বটেই—কাব্যকেও, এমনকি মহাকাব্যকেও (পৃ ১৭ ও ২০, শশিভূষণ)। এখন বলা হয় কী? না, কারণ ওরা স্বনামেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তো 'রচনা' আজো স্বনামে চলছে না কেন? বাংলাভাষায় নতুন এই শব্দটার বয়স দেড়শ বছর হয়ে যাবার পরেও? খদ্দরের মতো পৃথুল প্রবন্ধের তলে চাপা পড়ে থাকলে রেশমের মতো মসৃণ রচনার

www.pathagar.com

অস্তিত্ব তো বিপন্ন হবারই কথা। তাই ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তকেও তাঁর 'রচনাসাহিত্য'-উপনামক পুস্তকটি শেষ করতে হয়েছে আক্ষেপের সঙ্গে :

> 'মোটের উপর মনে হয়, আধুনিককালে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য দিক যেভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, রচনা-সাহিত্য সেরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না। ... অন্যদিকে গুরুগম্ভীর পল্লবগ্রাহিতায় সাময়িক-পত্রের পত্রগুলি প্রবন্ধকণ্টকে আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আশাপ্রদ ব্যতিক্রম একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু বড় বিরল'। (পৃ ২০৩-২০৪, প্রাগুক্ত)।

সুকুমার সাহিত্যের এই সূক্ষ্ম রংরূপটিকে সম্যক চিনে নিয়ে এর কাঙ্ক্ষিত লালনে কোনো জটিলতা তো দেখি না। প্রবন্ধ-সন্দর্ভকারের গবেষণা বা তত্ত্বালোচনা নয়, কৌতুকপ্রিয় লেখকের রঙ্গরসিকতাও নয়—এসে বা রচনার প্রধান লক্ষণ হল সৃজন, উদ্ভাসন, আলোকন, স্বপ্রকাশন। এক কথায় এ হল চমৎকৃতিমণ্ডিত এক সাহিত্যিক সৃষ্টি। রচনায় উচ্ছ্বাসেরও প্রশ্রয় আছে, যেটার কোনো আশ্রয়ই প্রবন্ধ অথবা সন্দর্ভে নেই। সেজন্যেই ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠতম কোষকার ডক্টর স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪) যখন এসে-কে 'আ লুজ স্যালি অফ মাইন্ড' বলেন তখন তিনি গদ্যসাহিত্যের রচনা-নামক সংরূপটিকে ওই একটি শব্দবন্ধেই একেবারে খুলে তুলে ধরেন। কারণ, প্রবন্ধ-সন্দর্ভে শৈথিল্য অথবা আকস্মিক উচ্ছ্বাসের কোনো অবকাশই নেই। আসলে এসে'র তো অর্থই হল চেষ্টা—যেটা হতেই পারে আদিহীন, অন্তহীন। প্রবন্ধ-সন্দর্ভের যেহেতু সিদ্ধান্তসংবলিত শেষটা থাকতেই হবে—সেহেতু ওদের আদি-অন্ত তো বটেই, দৈর্ঘ্য-প্রস্থও নির্দিষ্ট; নির্ধারিত।

সংগীতের পরিভাষায় ধরা যাক, সন্দর্ভ-প্রবন্ধ হল ধ্রুবপদ। ধ্রুবপদের নিয়মাবলী লঙ্ঘনপূর্বক নানারূপের অলঙ্কারযোগে যথেচ্ছাচারী গায়নকে যেমন খেয়াল বলা হয়—তেমনি প্রবন্ধের রীতিনীতি ভঙ্গকারী যথেচ্ছাচারী লিখনকে রচনা বলা হয়। তবে লক্ষণীয় যে, রচনা-নামক খেয়ালি লেখার যথেচ্ছাচারের সীমা আছে। টপ্পার ভুবনে ঘুরপাক খেয়ে জমজমা-গিটকিরির কারুকাজ দেখিয়ে—এমনকি গানের পদের প্রত্যেকটি শব্দকে অলঙ্কারে মুড়িয়েও দিতে পারে স্বেচ্ছাচারী খেয়াল। কিন্তু তারও নিচে নেমে আখড়াই-হাফআখড়াই-আসরের খেমটাওয়ালি সাজার খামখেয়ালি করতে গেলেই খেয়ালি-লেখাটা রচনাসাহিত্যের আসর থেকে ছিটকে, পড়ে যাবে হাস্যরসাত্মক রচনার এলাকায়। অন্য কথায় বর্ণিক মঁতেইনের বংশধর হয়ে যাবে রসিক রাব্‌লের সাগরেদ। মোট কথা, রচনাসাহিত্যকে লঘুশাস্ত্রীয় থাকতেই হবে। লিটারারি এসে বা সাহিত্যিক রচনাকে 'খেয়ালি লেখা' নাম দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেন 'খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস ... আমি খেয়াল-বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী—যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়'। (পৃ ২৩-২৪, *বীরবলের হালখাতা)*।

www.pathagar.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে বীরবল এই ধ্রুবসত্যটি উচ্চারণ করেছেন :

> 'হালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কারণ থাকত না, যদি না সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার সম্ভাবনা এসে পড়ত। কদলীবৃক্ষের অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গ সাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কন নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলীভক্ষণই লেখা আছে'। ('বাংলার ভবিষ্যৎ', *সবুজপত্র,* অগ্রহায়ণ ১৩২৪)।

উল্লেখ্য যে, 'রম্যরচনা'-নামক মনগড়া এক থসথসে কেয়ারির ওপর, প্রমথ-কথিত, অসার সরস এই কদলীবৃক্ষের চাষেরই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে আজ অনেক-ক'টি দশক ধরে। এমনকি কদলীপুষ্প সদৃশ বলে 'বার্ড অব প্যারাডাইস'-নামক অপরূপ পুষ্পটিকেও কলদিপুষ্প বলা হচ্ছে—অর্থাৎ রূপরসের পার্থক্য বুঝতে না-পেরে রচনাসাহিত্যকেও রম্যসাহিত্য বলা হচ্ছে, অন্যকথায় রসপণ্ডিতকেও হাস্যরসিকের তকমা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি 'অন্তরঙ্গরচনা'-নামক উপসংরূপ সংযোজনকারী বাংলার একক 'অন্তরঙ্গরচনা সাহিত্যিক' সৈয়দ মুজতবা আলীকেও ব্যাজ পরানো হচ্ছে 'রম্যলেখকে'র।

'বড়বাবু' বলতেন, বাংলা ভাষা এখনো এমন দুর্বল যে সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা কঠিন; তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটি কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরেই একটি জুতসই সহজ বাংলা শব্দ আসে, তবে নির্ভয়ে সেখানে লাগানো উচিত। অর্থাৎ তিনি 'গুরুচণ্ডালি' অনুশাসন মানতেন না। অর্থাৎ উক্ত অনুশাসনটি না-মেনেই সিদ্ধি লাভ করেছেন বড়বাবু। মুজতবা আলীও তাঁর অতিশয় শ্রদ্ধেয় বড়বাবু ওরফে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুসৃত এই গুরুচণ্ডালির সাহায্যেই নিজের সিদ্ধিটি লাভ করেন। এর উদাহরণ মুজতবা-রচনার ছত্রে ছত্রেই প্রাপ্তব্য। পূর্ব-সৈয়দীয় আম্মো (আমিও) তিন্নো (তিনিও) অ্যাম্মোটা (ইয়া মোটা) কদ্দিয়ে (কত দিয়ে) শব্দাদির সঙ্গে অর্ধ-সৈয়দীয় জউরি, হরিন্নুট, খাপ্‌সুরত শব্দাদির সঙ্গে ফরাসি গুর্‌মে, প্ল্যাশেৎ, ও রেভোয়া, ফ্যাতাকঁ্যাপ্লি শব্দাদির সঙ্গে ল্যাটিন মডুস ভিভেন্ডি, মডুস অপারেন্ডি; ইতালিয়ান মাদোন্না প্রভৃতির সঙ্গে জর্মান লাইট মোতীফ, গুটন্ আবেন্ট, গুটেন্ টাখ্, ইদে ফিক্স্; ইংরেজি হৌজ, কাবার্ড, প্যুরিটান, এবুজিঙ্ ইত্যাদির সঙ্গে আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু অর্থাৎ তথাকথিত 'যাবনিক' শব্দাদি যথা নাজাইজ, বিদাত, জাননেওলা, চন্দ্-রোজ, ইন্‌কার-নফরৎ, বে-এক্‌তেয়ার, বুরীবাৎ, হামেহাল, খুদ-কুশী, বাট্টায়া, দিলচ্‌সপী, জান্-তর্, গায়ের মুম্‌কিন্, আন্দেশা, গুঞ্জাইশ, দুব্‌লা, মেক্‌দার ইত্যাদি।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত বেশুমার ব্যঞ্জন দিয়ে রান্না করা খানা—অন্যকথায় সৈয়দীয় তাবত রচনা—বাঙালি পাঠকসমাজের জন্য যেন এক চিরন্তন মেজবানখানা। কারণ এ এমন এক স্বাদু ককটেল যার 'সোয়াদে'র পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ককটেলটির রেসিপি আস্ত একটা এনসাইক্লোপিডিয়া—অধ্যাপক অরুণ বসু যার নাম দিয়েছেন 'এনসাইক্লোপিডিয়া আলিয়ানা' (ভূমিকা, ৭ম খণ্ড, মু.র., মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা)। উক্তিটি মুজতবার বিশ্বকোষ সদৃশ পাণ্ডিত্যের নিম্নরেখাস্বরূপ। একটি উদাহরণ :

'ওঁর কথা আমরা এমন গোগ্রাসে গিলতাম যে তিনি বিদগ্ধ না অর্ধদগ্ধ তা বিচার করে দেখার ফুরসতই পাইনি। তবে আড্ডাবাজ মুজতবা আলীর যে পরিচয় আমীনুর রশীদ চৌধুরী সাহেব সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের জবানীতে (*দেশ*, ৪১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, পৃ. ৪১৬) দিয়েছেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি। পাঠক মহাশয়েরা এর থেকেই কিছুটা আন্দাজ নিশ্চয়ই পাবেন।

> "দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা শুনিতে শুনিতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়া গিয়াছিল। পাশে একটি কফির দোকান ছিল, প্রস্তাব করিলাম সেখানে একটু গিয়া বসি, এক কাপ কফি খাই। তারপর সেখানে বসিয়া কফির অর্ডার দিয়া পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কথা দুই পক্ষেরই জিজ্ঞাসাবাদ চলিল। একজনের কথা উঠিতে আমি বলিলাম সে সর্বনাশের পথ ধরিয়া সারাদিন মদ খাইয়া চুর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য—আমি মদ খাই না এবং সাহচর্যগুণে ঐ জিনিসটির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। মুজতবা আলী কিন্তু সেই মদের উপর কথা পাড়িয়া বসিলেন। পৃথিবীতে কত রকম মদ আছে এবং ঐগুলো কিভাবে তৈরি হয়, কিভাবে খাওয়া হয়, কোন্ মদের স্বাদ কি রকম—এই সবের আলোচনা—বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। উনি যখন তাঁহার কথা শেষ করিলেন তখন আবিষ্কার করিলাম সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া গিয়াছে। আমাদের দুপুরের খাওয়াও হয় নাই।"
>
> 'আগে মুজতবা আলীর কথাবার্তা শুনিয়া মনে করিতাম যে তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই। কিন্তু আমাদের মতো তিনটি প্রাণীকে প্রায় ঘণ্টা দশেক যাবৎ যে তন্ময় করিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই একথা কি করিয়া বলি।'
>
> (গৌরকিশোর ঘোষ, ভূমিকা, ২য় খণ্ড, মু.র., মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা)।

এত পাণ্ডিত্য নিয়ে মুজতবার এত জনাদৃতির পেছনে তাঁর আকর্ষণীয়তার অশেষ উপাদানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এক অমূল্য সম্পদ—সেটা তাঁর অতি বিশিষ্ট কৌতুকরস। মুজতবার এ-দিকটির ব্যাপারে বঙ্কিম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেটাই হুবহু প্রযোজ্য :

> '... উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। ...এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।'

www.pathagar.com

হাস্যরসের যেন অফুরান এক ডেটা-ব্যাংক মুজতবা—যেখানে পাঠক রসটির সব রকমের ভ্যারাইটিই মজুদ পায়। তাঁর কাছে আছে পরশুরামের প্রসন্ন হাস্যরস, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষণ্ণ হাস্যরস, ত্রৈলোক্যনাথের হৃদয়বৃত্তি, প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবৃত্তি—আর চাই কি। তবে হ্যাঁ, হাস্যরসের বিদ্রূপপুষ্টিতে তিনি তেমন উৎসাহী নন। উইটের চেয়ে বেশি হিউমার—এই হল তাঁর পাঠকপ্রিয়তা বাড়ানোর আরেকটি ফ্যাক্টর। ঠিক এই কারণেই উইটি চৌধুরী মশায়ের চেয়ে হিউমারাস সৈয়দ সাহেবের পাঠক বেশুমার বেশি। তাই বলে উইটের কমতি নাই মুজতবায়। কারণ উইট হচ্ছে হিউমারের উন্নয়নের উপাদান, বুদ্ধিপ্রধান, বৈদগ্ধ্যরসরূপে প্রাণবান হাস্যরসের শক্তিসঞ্চারী জ্ঞাতি। অর্থাৎ হিউমার যদি হয় মানসিক অবস্থা, উইট তবে মানসিক শক্তি। হিউমার যদি বিশেষ, উইট তবে নির্বিশেষ। এই নির্বিশেষের পরশেই নেহাত জীবনানুসৃতি হয়ে ওঠে অতিশয় মহৎ এক শিল্পকৃতি। সে-সূত্রে মুজতবা আলী একজন মহৎ শিল্পী। তাঁর অন্তরঙ্গরচনার শৈলী নজিরবিহীন।

আবদুশ শাকুর

একুশে ডিসেম্বর ২০০৫ — ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

www.pathagar.com

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানি নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে-কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়। তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকত, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কী? প্রথমত—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শনে কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কী।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কী প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মতো সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়তো ওমর খৈয়াম বলেছিলেন—

www.pathagar.com

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্বমঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপ স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কী করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসি ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোনো ভালো বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসি প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোনো ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই, বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

www.pathagar.com

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো একগাদা নূতন নূতন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মতো, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপি হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কী করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer: আর বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

*　　　　*　　　　*

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমনকি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছ ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত, তার কারণটা কী?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে

www.pathagar.com

আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ.ই.ডি. দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সবকিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালোবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়তো মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক-বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সবকিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটল নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

www.pathagar.com

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন-ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোক কেনা-কাটার খবর জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকিট বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

আর কত বলব? বাঙালির কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালির পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না, সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশগল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ-বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড় যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে-না-পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে, সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মতো শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মতো জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশেকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোনো লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়তো বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসি, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বচ্ছর! অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমার আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে "গঙ্গাস্তান" যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;—একগাদা পাথর দেখায় যে কী তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে

www.pathagar.com

পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা-কিছু জ্ঞান-গম্যি তা ঐ আড্ডার ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মতো শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা-পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টেরই মতো চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন-তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সবকিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সক্কলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই-বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরল। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানাল তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসি, টুটাফুটা আরবি, পিজন্ ইংরিজি সবকিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম, পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে। বাঙালি আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবুক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফিরিওলা নিয়ে আসে না! আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানি একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

www.pathagar.com

একপ্রস্ত সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কী করো কী!' বলে বাধা দিলেন! 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কী জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রিক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু আনা লাভ। অথবা কুইট্‌স।' তারপর আড্ডা আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ। সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি,—শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিসে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রিক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রিকে গ্রিকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশি দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্‌থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতিবাড়ির মতো আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে, না মৌলবি সাহেবের জোব্বা কেটেছে? ও কি পাতলুন, না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বলে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরি হল। আমি সেইটে পরে বরের মতো লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

www.pathagar.com

আহারাদি

যে লোক উদ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশি-বিদেশি যে-কোনো গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নূতন গাছ। তখন নূতন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নূতন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজি শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষায় স্বর-ব্যঞ্জনের বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্স এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজি উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়তো কোনো কাবুলিওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুরগির ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রিটের মতো রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানরা যেরকম রান্না করে ঠিক সেরকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়তো আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানাপ্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে? তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নিকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুণী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতি দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোঁরা থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকি ক'টা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার মতো আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন

www.pathagar.com

যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরোয় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কী, কিন্তু কোনো হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবাবের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণীবিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমে রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবর্জিত। মশলা জন্মে প্রধানত ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইয়োরোপে মশলা হয় না। তাই ইয়োরোপীয় রান্না সাধারণত মশলাবর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান—মোগলরা যেরকম ভারতবর্ষের অলঙ্কার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানি ইরানি স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল বানাল, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা' 'আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালি আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা : এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়)। এমনকি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোল্হাপুর রাজ্যের সরকারি অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথমদিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবেন।

www.pathagar.com

আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ-শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিমপানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোনো বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলিরা বলে 'জরদ্ চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পৌঁছয় নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্‌সটমিটে'র পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রিস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রিসের পোশাকি রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরিজি রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রিসেও প্যারিসি রান্না পাবেন। গ্রিস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রিসে (দেশটা বেজায় সস্তা)। লঞ্চ, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসি মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রিক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ্ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রিসে এ জিনিসের বড্ড বেশি চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাকু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালির অবদান কী?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালি বিধবার নিরামিষ রান্না।

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসি এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা করে আমি 'প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে 'জীর্ণে ভোজনং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটু বাক্যটা তিনিই কয়েছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা ॥

www.pathagar.com

'কলচর'

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যেকে বাঘ তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশি, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশি ভূত, অদ্ভুত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারি, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি বেশি ভয় পেয়েছি 'কলচরে'র সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানিনে; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালি বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কী প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালি অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়তো ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের আরাবেস্‌ক্, ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্যকলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকরা আমাকে

www.pathagar.com

স্কুল-কলেজে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়র, কি গ্যোটে সর্বযুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা; এ-কবিতা মাইকেল রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্‌গে। না পালাবার জন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই আমি পালাব কেন?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌ট আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই, লিফ্‌ট উপরের দিকে চলল, পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখানে থামে না। থামল গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মধ্যিখানে।

একে তো গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজি হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

www.pathagar.com

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহন্নতে পাওয়া যায়; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতি সইতে হয়।

আমি আর কী করি? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে-না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। ওঁরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্' নই, তাই বলতে পারব না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজি নই। তাই বলছিলাম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই।

www.pathagar.com

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক'ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে-কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হয়েছিল, এদেশে বুঝি আদপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অদ্ভুত চেহারা! সাহারার ধুলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যেরকম পাগলা বুড়ো চেপে বসেছিল—সে ধুলা সরানো দুদশটা হৌজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বুলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতুম, এদের কপালে কি কোনো প্রকারের মুক্তিস্নান নেই?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে বললে, তার দেশে নাকি ষাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচ্চা-বাচ্চারা, এমনকি গোটা কয়েক জোয়ান মদ্দরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, 'আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়ল গো। আমরা যাব কোথায়? কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে। গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।' সুদানি ছেলেটি আমায় বুঝিয়ে বললে, 'আরবি ভাষায় মৎর্ (বৃষ্টি) শব্দ আছে : কারণ আরব দেশে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবি ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয় নি বলে সে শব্দটি সুদানি মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ অজানা।'

সুদানে যাই হোক। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করেছিল; আমি ঠিক সেইরকম 'ঝড় নেমে আয়' বেসুরা বেতালা করে গাইলুম আর আমার জোব্বাজাব্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না-থামার পূর্বেই ফিরে এলুম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাব, বাঙলা দেশে কীরকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কী অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আড্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ'আনা, কেউ দু'আনা। আমাকে দেখামাত্র

www.pathagar.com

সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কী ব্যাপার, চটছ কেন?

সবাই একসঙ্গে কথা কয়। কী মুশকিল। ভাবখানা অনেকটা;—এই ড্যাম নুইসেন্স বৃষ্টির প্রশংসা আমি রাস্কেল ইন্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি? আর দ্যাট্ পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সে-ই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা পিছলে-পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলুসের বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি বলে পাউলুস মর্মাহত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহা মুশ্‌কিলে পড়লুম। জুৎসই কী উত্তর দিই! মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল; তার বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' এদের সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলুম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়তো মোলায়েম হবে। বললুম, 'বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কী প্রকারে?'

সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বদ্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে-কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বলল, 'কাইরো শহরের ভিতর কি যবগম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন? যবগম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতর কেন?'

শরিফ মুহম্মদ বলল, 'সেখানেই-বা বৃষ্টি হবে কেন? আমাদের গমধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে, কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না।' আমি কী উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রিক সদস্য পাউলুস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলুসের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়াল।

কী হয়েছে, কী ব্যাপার?

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না-তুলেই ফুঁপিয়ে যা বলল তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বান্ধবীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এ যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশন্‌ড হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পন্থা আড্ডা যদি তাকে না বাৎলায় তবে—ইত্যাদি।

www.pathagar.com

আমাকে তখন আর পায় কে? হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'ওরে মূর্খের দল, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য বিরহ। আর বিরহ্‌ কারে কয়, সে-কথা কী করে জানবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কী করে ওৎরাবে বিরহবেদনা যদি মানুষকে পাগল করে না তোলে?'

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস, শূদ্রক যে বিরহবর্ণনা রেখে দিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোনো সাহিত্যের বিরহবর্ণনায় তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানি বর্ষা!!

www.pathagar.com

প্যারিস

জর্মন ভাষায় একটি গান আছে :

In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fiuestern Monsieur,
ich bin Dein,—

অর্থাৎ :

প্যারিসের মেয়েগুলো কী মিষ্টি!
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
'মসিয়ো আমি তোমারি।'
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় 'তুমি' বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, 'তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না।'
কিন্তু হায়, শুধু তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে!'

ইংরেজিতে বলে, 'কেরিং কোল টু নিউ কাসল্', হিন্দিতে বলে, 'বরেলিমে বাঁস লে জানা' (বরেলিতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে), রাশানে বলে, 'তুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশির ভাগ সামোভার তৈরি হয়), গুজরাতিতে বলে, 'ভরা কলসী নিয়ে নদীতে যাওয়া' এবং ফরাসিতে বলে, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া!'

ফরাসি প্রবাদটিই মুখরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড্ডই দিলদরিয়া? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অন্তত একবারের মতো প্যারিসে যাওয়া? এমনকি যে জর্মন ফরাসি জাতটাকে দুচোখের দুশমন বলে জানে, সেও ফরাসিনীর নাম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ মুসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নস্যি।

www.pathagar.com

এ অধম ছেলেবেলায় এক ভশ্চায্যি বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্য কোন্ হিরন্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমত প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মতো (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কী প্রয়োজন?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসি মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে—অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না-হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সবসময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যেসব দেশে কোর্টশিপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটে নি আর এন্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুরৎ বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া? হবেও না।

তবে একথা অস্বীকার করার যো নেই, ফরাসি মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশি বিদগ্ধ। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাত-ফাত, সাদা কালো, দেশি-বিদেশি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে তাই, হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মতো সুন্দরী ফরাসিনী যমদূতের মতো বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যান্ডেজ ওর ইন্‌জেকশন্ হামেশাই বিন্‌ফিতে করে দেয়।

জর্মন মেয়ে বিদেশিকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসিনীর চেয়েও বেশি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিরদিনই তার কাছে 'আউসল্যান্ডার' (আউটল্যান্ডার) বা 'বিদেশি'ই থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসিনীর মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচরড্ আর অনকলচরড্। ফরাসি, বিদেশি এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিব্য ফরাসি বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপাঁর রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেন্ডি সম্বন্ধে ওকিবহাল, ব্যস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সসম্ভ্রমে ভারতীয় কায়দায় বলেন, 'ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট', তবে ফরাসিনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, 'কোন্ সব্‌জেক্টে মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?' ফরাসিনীর বিশ্বাস

www.pathagar.com

অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসিনী জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এরকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবেন না।

কিন্তু ফরাসিনীর সব চেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দৃষ্টিকটু রুচি-বিরুদ্ধ বলে, নিজেকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

অর্থাৎ ফরাসিনীর কাছে টেস্‌ট্‌ বা রসবোধ মরাল্‌ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশি বরণীয়।

www.pathagar.com

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছি নে—সেসব শব্দ তৈরি হতে দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যেগুলো সাহিত্যক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজির উদাহরণই নিন্। ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্বভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত 'নির্লজ্জে'র মতো পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ মহাদেশ থেকে। গ্রিক, লাতিনের মতো দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসির উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা!!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মতো বলে, "ঠিক বলেছে, আমার মনে ওঠে নি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজি!"

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবি, ফার্সী, তামিল, হিন্দি, মালয়—কত বলব?—দুনিয়ায় তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সবকিছু নিয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। 'এডমিরাল' নিয়েছে আরবি 'আমির-উল-বহর' থেকে, 'চেক' (কিস্তিমাতের) নিয়েছে ফার্সি 'শাহ' থেকে, 'চুরুট' নিয়েছে তামিল 'শুরুট্টু,' থেকে, 'চৌকি' নিয়েছে হিন্দি থেকে, 'এমাক' নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শব্দ বাবদেই; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নকিষ্যি কুলীনের মতো উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এ-দেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখে নি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায় ইলিশমাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখল না; আমরা তাকে খুশি করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুলল না, ছানার কদর বুঝল না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষ-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেন্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লন্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায়

www.pathagar.com

গিয়ে ফরাসি রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরতে রাজি হব না।)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না-হয় বুঝলুম; কিন্তু ইংরেজের মতো দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাজ্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটাকয়েক শব্দ দুশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্ট-ভাফ্ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, 'লুফ্ট-ভাফ্ফে, লুফ্ট-ভাফ্ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না', ব্লিৎস্ক্রিগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, 'ব্লিৎস-ক্রিগ, ব্লিৎস-ক্রিগ।'

আর বেতামিজিটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন "স্বাধিকার-প্রমত্ত" বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড়কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার-গিয়ার ফপরদালালি করো না।"

পাছে এতসব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে-চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মতো ডোন্ট থ্রো ইয়োরসেলভস আন্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারে নি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসি জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়ে যান, বিদেশি শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসি অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম'। 'আশ্রম' শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসি নৌকা বানচাল হয়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসিতে লিখবেন কী প্রকারে, অথচ ফরাসি ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, 'প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্তত ভাবলোকে—সে-কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।' বেনওয়া সায়েব ফরাসি কায়দায় শোলডার শ্রাগ করে বললেন, 'উঁহু-বদহজম হবে।' সায়েব শেষটায় কী

www.pathagar.com

করে জাতরক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশত একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসি চিঠিপত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসি পক্ষ হামেশাই ইংরেজপক্ষকে দোষারোপ করত যে, ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আবৃছা আবৃছা করে লেখা যায়। ফরাসিতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চাবাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সবকিছুই পরিষ্কার, কোনোপ্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসি এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়ল বিপদে।

কিন্তু ফরাসিরাও গম যব দিয়ে দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসি কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠিপত্র ইংরিজিতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, 'সে কী কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশি বাজে খর্চা হবে, এমন কম্ম করতে নেই।'

তখন একটা সমাঝাওতা হল।

* * *

Gepaeckaufbewahrungstelle!
শব্দটা শুনে মূর্ছা যাই আর কী!

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষায় জানি শুধু ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসি সহযাত্রীকে ট্রেনে বার্লিন পৌঁছবার কিছু আগে জিজ্ঞেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-অফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কী? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungstelle!

প্রথম ধাক্কায় এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারব, সে দুরাশা। আমি করি নি। মসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একদা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হত বই কী।

জর্মন ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজির মতো দিলদরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসির মতো শব্দতাত্ত্বিক বাত-ব্যামোও তার এমন ভয়ঙ্কর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না

www.pathagar.com

পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরেজি ও ফরাসির মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজি রবরের মতো তাকে যত খুশি টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মতো উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজি beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা'। জর্মন সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই নে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখ চেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশি 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে'র প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা 'নিত্যসা ফতেনা দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশি লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্কারা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেন নি। 'ড্রগিস্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen mischungverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয় : 'স্বাস্থ্য', 'পুনরায় দান', 'সর্বভৈষজ', 'একসঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্যপুনরদানসর্বভৈষজসংমিশ্রণশাস্ত্রজ্ঞ'।

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফতেনা' জাতীয়)।

সংস্কৃতভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমতো আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নতুন সমাস যদি-বা আমরা বানাই তবে, কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুঘর', 'হাওয়া-গাড়ি' কিছুতেই চলল না।—ইংরিজি কথাগুলোই শেষপর্যন্ত ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসল। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার 'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনোকালেই করি নি।

www.pathagar.com

বিশেষ করে এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশি শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সে-কথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশি শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায় সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বাড়ানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরিজি ফরাসি, কেঁদে-কুকিয়ে দৈবাৎ দু'একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাইব্রাও', 'রঁদেভু'। এ প্রবৃত্তি যে-ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিই-ই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালি খাঁটি বাংলা শব্দ দিয়ে খাস সমাস বানাত। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে', দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা-গোঁপো'তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

একেই বলে সমাস! চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যেরকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষায় লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষবয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষরাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন :

ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ 'নাম-না-জানা' পাখি,
দক্ষিণের 'দোলা-লাগা', 'পাখি-জাগা' বসন্ত প্রভাতে

তাই বলি বাঙলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া', 'হতভাগা' নয়! শুধু হাতির মতো আমরা নিজেদের তাগদ জানি নে।

www.pathagar.com

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্তরাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা; যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসি কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কাত্তিকের মতো চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এরকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন। কী করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসিটা বলতে পারেন তো? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম 'ফরাসি ভাষাটা সবসময় ঠিক বুঝতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি; আবার যখন ল্যান্ডলেডি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসি ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে-কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা, যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গসুখলিপ্সু।

ফরাসি ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভালো জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কী প্রকারে? আমি যে ফরাসি সে তো আর বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারিনে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না-হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি "জার্নালিস্ট" তাহলে তার মানে কী হল?'

একগাল হেসে বললুম, 'তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু হল না। ঠিক তার উল্টো: আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি, "আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে", তবে তার মানে কী?'

www.pathagar.com

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না : বললুম, 'তার মানে আরেক দিন দেখা হবে, এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?'

বললেন, 'ফেল্!' তার মানে হল, 'আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন'।

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও যখন বাঙলায় বলি, "এবার তুমি এসো" তখন তার অর্থ "তুমি এবারে কেটে পড়ো"।'

'ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম, আমি জার্নালিস্ট : কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই।

'এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাইটে রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানি নে গির্জে মেরামত করে দিয়েছেন, কোন্ সেন্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন এইরকম ধারা কত কী? আমি খবরটা শুনে বললুম, "বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি"।'

'করলুম কী, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যিখানের ছবি তোলেন? স্রেফ গাঁজা; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি নাড়ীভুঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রুপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

'সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর।'

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরৎ হতে হয়। আমি—' বলে থামলেন।

আমি বললুম, 'আপনার চেহারা সম্বন্ধে কী আর বলব—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর করলুম কী জানেন, একপ্রস্ত উত্তম সুট পরে, গোঁফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাঙ্গো ওয়ালটস নাচের নবীনতম "অবদানগুলো" রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থাড্ডে কেলাস খোলামকুচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পাত্তাটি পাবে না; কিন্তু খোলামকুচি না হয়ে যদি পদ্মফুল হই—চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা হলে নর্তকী কি একটুখানি মোলায়েম হবে না?

'আমি অবিশ্যি নর্তকীকে প্রিয়ারূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাই না। মসিয়ো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ঢলাঢলি করুন আমার তাতে নস্যি। আমি শুধুই চাই একটুখানি খবর।

'কিছুটা ভাবসাব হয়ে যাবার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দুঘোড়া না চড়ে আড়াইশ'টা চরুন আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মতো নির্বিকার। আমি একটুখানি প্রেমেই খুশি।

www.pathagar.com

'কাজেই আস্তে আস্তে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়েটে কবে ক'দিন ক'রাত্তির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম, অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, "নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই, তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপব না"।'

অনুস্বার জউরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝলেন আমিও কাঁচা নই।

তারপর বললেন, 'লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিটখানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ "না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট"। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম ॥

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতে একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লন্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিউটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি। সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা-বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশি হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশি।' তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সূ তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীনদেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন; সভার উদ্দেশ্য, কী প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুঞ্জেছেন সে-কথা সকলেরই জানা ছিল।

www.pathagar.com

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীনদেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এসো ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কী করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।"

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমনকি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কানা করে দে ছুট! দে ছুট! তিন সেকেন্ডে মিটিঙ সাফ— বিলকুল ঠাণ্ডা!

'কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বারবার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তার সামনে চেঙ্গিস খানও তসলিম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু', 'শাবাস, শাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মতো গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কী?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল!

হাত জোড় করে বরজলালের মতো ক্ষীণ কণ্ঠে ইমনকল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওহ্ কী দজ্জাল, কী খাণ্ডার! বাপরে বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন 'ওহ্! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অত বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত-মহারাজ! দশ লাখ?' 'দশ লাখ।'

www.pathagar.com

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হল—বিষ্যুদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মতো, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ-পাতার মতো সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেন্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন,'তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।' মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, 'তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে, হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, "যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।" তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালাল।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি??

www.pathagar.com

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি, সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোটগল্পে তিনি মপাসাঁ, চেখফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোনো মিস্টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, সত্যদ্রষ্টা হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যান ভক্তজনের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা দেবে তার ইয়ত্তা নেই আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতন নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করব না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে' এমন কোনো জিনিস বাদ দেন নি যে-সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে দিতে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এরকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি সে হচ্ছে গীতিরস। শেলি কীট্স গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সবকিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,
আমার যেমন আছে।'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা লোপ পায়।

জর্মন যখন 'লিডার' কিংবা ইরানিরা যখন গজল গায় একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে :

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লিডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লিডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারত। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায় নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সবকিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য : রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারত না—নটরাজর মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মতো রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে রসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে'। আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে'।

'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
কোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

www.pathagar.com

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥'

তারপর এ-ধারার কী অপরূপ বর্ণনা—

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা—মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

www.pathagar.com

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবি ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সিতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোনো দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববন-বিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কী সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কী সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।

সদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখ্খুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দুবার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

www.pathagar.com

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশি, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ্' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহুঁ, সেটি হচ্ছে না, ও-খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক' ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমনভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এইরকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কী আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা, তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মতো মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস, ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কী লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠাল, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাব।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

www.pathagar.com

*   *   *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ ॥'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন, সেরকম হংসসাধক বিরল')

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।'

www.pathagar.com

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন আর স্কচ এই চারজন মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসি নিয়ে এল এক বোতল স্যাম্পেন, জর্মন নিলে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রিশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিনগুণ মিলে গিয়ে গল্প বেরল :—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লন্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নো টী!'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন, 'কফি?'

'নো কফি!'

'কোকো?'

'নো কোকো!'

ভদ্রমহিলা তখন মরিয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'হুইস্কি সোডা?'

'নো সোডা!'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যেসব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগই স্কচ্—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশির ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার!

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসি জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজি 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউ কাসলের' ফরাসি নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

www.pathagar.com

এ প্রবাদটি আমি ফরাসি ভাষায় শুনি নি; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসিরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসিরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসি মেয়েমদ্দ দু'দলই চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসি জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন, তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসিদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়তো পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসিরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্স সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তা আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সরাসরিভাবে—ইংরেজের মতো 'ফরাসি আর্ট' দেখার ভান করে না। কোনো জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই, হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম,' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসিরা বলে, 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসি জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসি হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরি বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলাকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজরা হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবি যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট্‌ করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আড্ডার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ্ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা'—অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ্ ধরা পড়ে তার নাম 'মাদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালিকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কীজীয়ে) মুল্লুকে পৌঁছনর পর তার নাম হয় হিল্‌সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা যেরকম ইলিশদেবীর পূজো দি, বাদবাকিরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে শুধু আমাদের মতো তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধিরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, 'কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধির রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডা নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসল, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মারাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) 'ফিরি' দেন বলে তাঁকেই সবাই যেন একটু বেশি তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

www.pathagar.com

অপিচ, পশ্য পশ্য কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সবচেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি, দিব্যি কাফেতে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি, পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছ, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন যে ভয়ও নেই—আর চাই কী?

শতকরা নব্বই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল'; বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ' পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মতো ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহহাব আতিয়া কপ্ট ক্রিশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসি কিন্তু ক'পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবি কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগদিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো চড়ে নি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রিক, বেশি নয়, কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে। মিশর রাণি, গ্রিক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশ কুটুম্বিতা আছে। হবেও-বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের গণতন্ত্র ক্ষুণ্ন হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া কাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না; বেশির ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুত কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (বুল অ্যান্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্থ করত।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদ আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ-বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছন্নের মতো

www.pathagar.com

হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশভ্রমণ যে কীরকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পাঁয়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করি নি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে 'মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কী দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কী করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীর তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি-বিনিময়ে ছিল। এক ফরাসি কবি বলেছেন, 'প্রেমের সবচেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে।'

তাবাঁ-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি?'

আড্ডার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহুপূর্বেই ধরা পড়েছিল। রোঁদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মতো মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স্‌ দি—সে-কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেন্ড করল।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা ছোঁড়া, মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবি বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

> 'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
> সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
> বিদেশীর অঙ্গ হতে—

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তেরো দিনের আরবিকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেন্ট নয়—তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদিব্যি নেই। দুম্‌ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম,

www.pathagar.com

'যগ্যিদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকি তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচির-মিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্ এক প্রদেশের—বিঙ্গালা, বাঙালি—কী যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালি। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালি। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাঁটগা, কাছাড়ের বাঙালি খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়'!

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালি।'

গ্রিক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়তো ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাঁকে নূতন জামাইয়ের মতো কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কন্‌স্টিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বার—।' কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রি কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পেছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;— আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কী? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মতো সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক' মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপি গরম প্রত্যাশা করি নি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

www.pathagar.com

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কী করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রিসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রিক, কিন্তু এই গ্রিক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রিসের উপর আধিপত্য করত তুর্কী এবং তুর্কী গ্রিসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রিক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মতো প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্‌টস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্‌টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কী মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কী কৌশলে, কী মসলা দিয়ে মিশনারিরা মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

www.pathagar.com

স্বীকার করি, মিশরিরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগল যুগে যেরকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরিরাও ঠিক সেইরকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি, যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করল, তামাকে কী করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লি, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেটফোঁকা পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেইরকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ?

বাঙালি তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কি না তার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারি পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরির চরম দুর্বলতা তার জুতোজোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবি ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরিতে 'বালিশ' রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর্।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস,' কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন?'

www.pathagar.com

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এসো!'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বললেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে, 'কাকে লিখলে?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কী?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কী। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় "ফামিনা" সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আহ্, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানি নে ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কী। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছে।'

এতক্ষণে একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মদ্দে যেরকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেইরকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশে ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবন্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভালো, কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন্ দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বড্ড একতরফা বক্তৃতার মতো হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডার সবচেয়ে ডাঙর দুশমন।

www.pathagar.com

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যকার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রিক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানি, ইতালীয়, ফরাসিস, ইহুদি এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি-ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ-কবর কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্ সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

*　　　*　　　*

মিশরি আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরি মাত্রই আড্ডাবাজ; এমনকি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরতেন। তবে হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের' উত্তর-পূর্ব কোণে বসেন। সেই টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেন্থ্ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দুদিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এঁরা হয়তো চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানিগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার বউ কোন্ মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয়া করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে

www.pathagar.com

গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন্ প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এঁরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এতসব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এঁদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এঁদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকি সরকারগুলো চলছে কী করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এঁদের যদি মস্কো, বার্লিন, লন্ডন, দিল্লির বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় কুল্লে সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায় দুনিয়া, তুমি জানছ না তুমি কি হারাচ্ছ।'

আপনি এদের চেয়ে বছর-দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে। কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশি বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সে-ই তড়পাত সবচেয়ে বেশি।

তা ছাড়া আপনি মাসে এক দিন কিংবা দু দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালেভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যেসব বিষয় কেটেকুটে ঘষে পিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়িকাটে ঢুকিয়ে রাম-দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনোপ্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকালবেলা বাড়ি ফিরবেন।

www.pathagar.com

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

এর পর পাণ্ডাদের সহৃদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মতো সাহস আমাদের মতো অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন 'মিয়াকী তোড়ী' অর্থাৎ মেয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিণী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুহাত দিয়ে দুটি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই—'হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগেভাগেই মাপ চাইছি।' সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত—মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।' কালিদাসও বলেছেন—সংস্কৃতটা মনে নেই—'বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।'

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই—যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ'ত না সে-বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি। উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে-কথা সবাই জানেন; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করেছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রাম যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।

সে-কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডা-জগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙল।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, 'শীরনী' বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রিস্টান,

www.pathagar.com

মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেম। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন.ও. ঐখানেই। সেখান থেকে গেলুম বেথলেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বেথলেহেমের বাস-সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালোই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড-বুক—পাণ্ডার 'এরজাৎস'—কাঁধে ক্যামেরা—হাতে লাঠি। আধঘণ্টার ভিতর বেথলেহেম গ্রামে নামলুম।

ভেবেছিলুম, দেখতে পাব, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরাজীর্ণ আস্তাবল—যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কপ্পুর। সবকিছু ভেঙেচুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করি নে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে-খচা আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো রসসৃষ্টি সেন্ট সোফিয়া, সেন্ট পল কোথাও আমি দেখি নি। সে-কথা আরেক দিন হবে।

গাইডবুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মতো টুপি, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মতো। পাদ্রী-পাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট ল্যান্‌গুইজ্? কেল লাঁগ? বেলশে শপ্রাখে? লিসান এ?'—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন্ ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, 'হিন্দুস্থানি।'

বলবে, 'দস্ পিয়াস্তর। অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও।

'দস্' ছাড়া অন্য কোনো হিন্দুস্থানি সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই-বা কি কম? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয়?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খ্রিস্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরিব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে—আর তাঁরই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?'

শুধু যে চোরাই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইডবুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রিক অর্থডক্স্ প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে—গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পৌঁছতে হয়।

www.pathagar.com

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' অম্মো না-ছোড়বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়তো অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, 'তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু; এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কীরকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কমুনিটি আছে।'

বলে লাঠিটা বার-তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকলে, 'শোনো।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ।'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরের জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে?'

'আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।'

খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানের কাছে মুখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, 'যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি তবে—'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে গিয়ে বলতে পারব তো?'

তখন হার মানল। আমরা বহু লঙ্কা জয় করেছি!!

www.pathagar.com

'নেভা'র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি, তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গীতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্বসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মতো। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের একপ্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কী হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রোববারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

www.pathagar.com

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবিহৃদয় অতিসহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনোফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়তো তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়তো মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছ কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

www.pathagar.com

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতাপুরুষেরই মতো।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কী নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বলো কী নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কী কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সবকিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে দামি জিনিস আনতে চাই। বলো কী আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোনো একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বলো, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি ॥

www.pathagar.com

ফরাসি-জর্মন

গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হস্তী' সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পৌন্ড্ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে-বৃহৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুট দিল। হরেক সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিককাল যাইতে-না-যাইতেই সে আসামের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল 'আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার'।

ফরাসি খবর শুনিয়া ধীরেসুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল 'লামুর পারমি লেজেলেফাঁ অর্থাৎ 'হস্তীদের প্রেমরহস্য'।

জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানা। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম 'আইনে কুর্ৎসে আইনক্যুরুঙ ইন ডাস স্টুডিয়ম ডেস এলোফান্টেন', অর্থাৎ 'হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা'।

গল্পটি প্রাক্-সভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান, না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় 'ধান্যেশ্বরী' জাতীয়) ও ত্রিশ বান্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, 'ভিয়েদিল লিলি ভি এলেফান্টি?' 'তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ?' অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যেসব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এইসব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই 'হাতি পুষিল'। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল 'বিগার অ্যান্ড বেটার এলেফেন্টস—হাউ টু গ্রো দেম?' অর্থাৎ 'আরো ভালো ও আরো বৃহৎ হাতি কী করিয়া গজানো যায়।' শুনিয়াছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক

www.pathagar.com

ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু 'নেটিভ' 'কালা আদমী' বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে!

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও না। কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মন ও ফরাসিকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে 'কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অর্ধপক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধ্যে পৌঁছাইয়াছিল।

জর্মন যদি কোনো ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি-উতি করিয়া যে-কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে, তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামি (তা আপনি যত ফর্সাই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কী খান, কী পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কান্ট বড় না শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া কেন?'

'কিন্তু হাঁ', বার-তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, 'হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখ্রীস্টের পরে আর হয় নাই (ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল)। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাঁহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না : আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যোটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাঁহার মন কাড়িল?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নেই ॥

www.pathagar.com

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসির প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশি রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশিকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশিরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশি : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়া পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজাদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবন-বিখ্যাত ফরাসিস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফ্কে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জঙ্গলির রান্না খাইতে গেলে!

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখো, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কী সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও? আমজাদীয়ার 'জঙ্গলি'ও তাই তোমার শেফ্কে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা-বোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখো। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ব বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢালো, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটাও,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,—ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছ কি শতকরা আশিজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?—অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন

www.pathagar.com

দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্রে যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপসিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফিক করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসীরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই?

সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় : ঐসব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ব মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ব। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘণ্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক 'মেকদার-অন পানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব : সে-কথা থাকুক। কিন্তু আমজাদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কী প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব : নোংরামি? সে কী কথা?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি, দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐদিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পুলিস ডাকিবে, ডাকিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ রাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয় : হ্যাঁ, আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালি খ্রিস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশমাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা—ফলে

www.pathagar.com

ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রুবর্ষণ)।

সায়েব : আহা! তবে ইলিশ না খাইলে হয়।

ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসি হইয়া শাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলে হয়; বাঙালি হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয় : সে তাঁহারা মানেন; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব : তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় : খারাপ ভালোর কথা জানি না সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু-যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পঙ্কে নিমগ্ন—ডাঙায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা, তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব : এসব তো বাইরের কথা : তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় : আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাইতে রাস্তায় যাইতে হইবে।

ডিসেম্বর ১৯৪৫

www.pathagar.com

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা-সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মত হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারো বড় বেশি আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে-অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্স ত্যাগ করার পূর্বে প্রাণভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর-সাতেক না-যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫-এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মতো 'পরিপক্ব'-হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫-এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমানধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মুসা), নোয়া (নূহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছায়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে

www.pathagar.com

হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা-ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় 'দশবাঁ নকলঙ্কী অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ শাহ'।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কী প্রকারে? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী সিন্ধু প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারিদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারিদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব—কিন্তু পাঞ্চরাত্র মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে-কথাটা আজও খোজাদের 'জমাতখানা'তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খান রূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে একমুহূর্তে সর্বসৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে-কোনো শতাব্দীতে—কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কী প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি-সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরানের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইলি মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা-সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজারা যদিও কোরানকে 'ভালো কেতাব'রূপে স্বীকার করেন তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছী

www.pathagar.com

এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব 'গিনান' গ্রন্থাবলীকে। 'গিনান' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞান' শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এসব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সবচেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জমাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংশ ফেলে দেয় এবং এইসব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে দান বলতে যা-কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা-সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎজোড়া—শাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এতসব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্লে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কী প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ। শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতু শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মতো বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টিল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশি। তবে?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল-দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প—এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি, খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না ॥

www.pathagar.com

গাইড

দিল্লিতে একটি সরকারি টুরিস্ট ব্যুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লিতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'পাণ্ডা' এবং 'গাইড' হরেরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়—তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন, পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহাধর্ম—ক্রিশ্চান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার উপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঁঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানির বকরি) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লি অনেকটা জেরুজালেমের মতো। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লিতে। কুতুব-মিনারের কাছে কুৎব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজামউদ্দীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলাউদ্দীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুগলুকের গুরু) আর দিল্লীর বাইরে শেষ গুরু নাসিরউদ্দীন 'চিরাগ-দিল্লি'র কবর। আর কালকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।

এসব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে এটা হচ্ছে আকবরের দুধ-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত!

বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা—ভক্তিভরে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহপিশাচ। বললেন, 'যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান!'

www.pathagar.com

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে-জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তারার পর পলস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।

* * *

দিল্লিতে ভালো গাইডের সত্যই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালি লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান—সে বিষয়ে তিনি 'দেশে' মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তারা না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাঁজা-গুল।

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সেসব গল্প শুনে আপনি এত খুশি যে দিনের শেষে তাঁকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এইরকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, 'এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পল্টনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারী রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুর বেরতেন সোনার পাত মোড়া গাড়িতে, বিবিসাহেবা বেরতেন রূপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সেসব দিন!'

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, 'দেখুন দেখুন, এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ যেরকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লজঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিমফনি—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন—তিনি এইখানেই রচেছিলেন।'

আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, 'একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়িতে দেহত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।

সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিস্তব্ধ। এই জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন!

* * *

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে।'

www.pathagar.com

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাংলাভাষাতে কখনও খুব বেশি চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালি যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোনো কারণ নেই। ইংরেজিতে একে বলে 'কাস্টম্ হাউস', ফরাসিতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল্-আম্‌ট্', ফার্সিতে 'গুমুরুক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভুতো সবাই সরকারি, নিম সরকারি, মিনসরকারি পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন তো আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলিকে তার হক্কের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুমুরুক'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখি নি। রহমত বোধ করি সেটাতে তার 'গুমুরুক'কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক এবং (সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সকলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সেকথা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ এযাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হক্কের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোনো গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ

www.pathagar.com

হয়েছে। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস্, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানি চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেইরকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁচিঁ করে বলবেন, 'ওটা তো আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে তো ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও তো ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভালো নয়। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্ট্রিপের পশ্চাতের সুদূর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে। তারপর বলবে, 'পনেরো টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বলে দেব! ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এই শার্টটার দামই তো মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনি কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল:

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত? এবং শেষ প্রশ্ন :

২। আপনার মৃত্যুর সন তারিখ কী?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

www.pathagar.com

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘরি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই তো আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহাভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নতুন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ কর্মে নতুন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ আমেরিকা যান। এতই বেশি যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যেরকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান, এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝান্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম পাক্ড় ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মতো তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বারকয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস'। আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝান্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা তো ট্যাপ করতে পারতেনই সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোনো আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝান্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে দিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার-টিম ম্যাচের ভিড়। ঝান্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝান্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী, সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝান্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টরে। মাল খালাসিতে

www.pathagar.com

তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মতো মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন, আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝান্ডুদার বাক্স-পেঁটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গালদুটো ভাঙা, সে-গালের হাড়দুটো জোয়ালের মতো বেরিয়ে পড়েছে, চোখদুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মতো চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মতো হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝান্ডুদা ঝান্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্‌স্‌পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস, আজ যে শেক্‌স্‌পিয়ারের এত নামডাক সেটা ওইদিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝান্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওইদিন থেকে শেক্‌স্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইন্ডিয়ান সুইট্‌স্‌।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝান্ডুদার দিকে তাকালেন তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশো ঢ্যাটরা পিটিয়ে কোনো বাদশাও ও-রকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।

ঝান্ডুদা মরিয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লন্ডনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ঢ্যাঁটরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝান্ডুদা পিঁপড়ের মতো নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লন্ডন পাঠিয়ে দাও,আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে তো বড্ড খরচা পড়বে। পাউন্ড পাঁচেক—নিদেন।'

হ্রস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজি হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ আইন তো সকলেরই জানা।

www.pathagar.com

ঝান্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক, ও-মাল যখন সোজা লন্ডনে চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি তো আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝান্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 'কিয়ান্তি'-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসি উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফিজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝান্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরেজিতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে, ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইন্ডিয়ান সুঈটস কিনা।'

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নিচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসি বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝান্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝান্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-সাদিতে ঝান্ডুদা ভূরি ভূরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালিদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তারপর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা-তিনেক ভাষায় তখন বাঙালির বহুযুগের সাধনার দিন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসিরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম!'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গিঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসি স্পাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে 'কিয়ান্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলা-বদলি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওঁদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়ান্তি'।

ওদিকে দেখি, ঝান্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে।

ঝান্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী!'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বললে না।

হঠাৎ, বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঝান্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝান্ডুদার তাগ সবসময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ! পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না!'—আরও কত কী।

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার। চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইল্‌দুচে মুস্‌সোলিনী—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিসটার, অ্যাম্বসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর তো বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবে না কেন? এ যে রীতিমতো বে-আইনি কর্ম। সরকারি চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সেঁকো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝান্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ, ডান্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কী ভানুমতী, এ কী ইন্দ্রজাল!

www.pathagar.com

দেখি, ফরাসি উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদগদ কণ্ঠে বলছে : 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস! এ ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান' এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে "মিরাক্‌ল্ দ্য রসগোল্লা"।'

উকিল মানুষ, সোজা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি।' আরও দু'চার পাষণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝান্ডুদাকে বহুকষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাব্‌ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুঁছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝান্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড়কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড়কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসি উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়ান্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝান্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তারপর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না-তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইন্ডিয়ান সুঈট্‌স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড়কর্তা হয়তো অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়তো কখনও ঘুষ খান নি। 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটা ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' তো হওয়া যেতে পারে।

বড়কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝান্ডুদা বললেন, 'একফোঁটা কিয়ান্তি?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

www.pathagar.com

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড়কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

'কিয়ান্তি না রসগোল্লা' সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাত মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন :

'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম :

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!

www.pathagar.com

বাঙালি মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্তোরাঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয় নি তখন জেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তোরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সবকিছুই দেন, কিন্তু তাঁর 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা। উনিশ শতকের নাটক-নবেলে একেই বলা হত 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেস্তোরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে—পুরনো যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মতো চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্ চা।

শুনেছি সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গী, মটন, মাছের সঙ্গে তাঁরা রাই খান না। মুর্গী, মটনের সঙ্গে না-ই বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল—এ তত্ত্বটা সায়েবরা এদেশে দু'শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে—এই নিতান্ত সন্দেশ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভালো না।'

ম্যানেজার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্ কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিতী মাস্টার্ডের উপর সরকার ট্যাক্সো যা লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের চেয়েও বেশি।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিতী মাস্টার্ড; চালান দেশের তৈরি খাঁটি প্লেন কাসুন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

ম্যানেজার আমার দিকে হাবার মতো তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাঁইয়া। তা আমি বটিও।

দিশীবিলিতী কোনো মাস্টার্ডই কাসুন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাসুন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ—আর বিলিতী মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসি মাস্টার্ডে বদ্‌খদ্ মিষ্টি-মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সক্কলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক করি নে, তত্ত্ব কারে কয় তারই চিন্তা করি। আমি তাই কাসুন্দির খেই ধরে তত্ত্বচিন্তায়

www.pathagar.com

মনোনিবেশ করলুম। আমরা আপন জিনিসের সম্মান দিতে জানি নে। হিন্দিতে যাকে বলে 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আফ্‌সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালি-রান্না খাবার রেস্তোরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালি নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারী তামাম কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালি-রান্নার সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-কটলেট-ডেভিল কিংবা কোর্মা-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান।' কলকাতায় বাঙালি রান্নার রেস্তোরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়—কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য!

অথচ দেখুন ইংরেজি (কিংবা ট্যাঁশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাতী ('অন্নপূর্ণা' দ্রষ্টব্য—খাওয়া না-খাওয়ার জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্ সুয়েজ ইডলিডোসে করহী, ফরাসি এস্‌কেলোপ দ্য ভো ও শাতোব্রিয়া, এমনকি ভিয়েনার ভীনার শ্লিংসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু ঘ্যাঁটি, অম্বল।

তাই ভাবছি, আপনাতে আমাতে একটা বাঙালি রেস্তোরাঁ খুললে হয় না?

বাঙালি সর্বভুক। তাই বাঙালি প্রবাদ 'লোহা খাই নে শক্ত বলে, "—" খাই নে গন্ধ বলে।' তাই বলে কি আমাদের রেস্তোরাঁয় সবকিছু থাকবে? উঁহু! আমাদের মাপকাঠি হবে—বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকি যেসব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে 'মেনু'টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে?

আমি মনস্থির করেছি—কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরের থালারও ব্যবস্থা থাকবে; নিতান্ত সাত্ত্বিক জনের জন্য শালপাতা, কলা-পাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্ আর নাই থাক্—চীনে বাসন ছুরি-কাঁটা বারণ।

এখন আহারাদি।

১। ভাত—আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকরখানী (বাদ দিলে চলবে না, পুব-বাঙলার বিস্তর লোক কলকাতায় আস্তানা গেড়েছেন), ঘি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না তো? ভেবে দেখুন। এ 'মেনু' তৈরি করা তো একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ-স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়: তাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে—অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তোরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই 'মেনু' বানাবার পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পদ ফরাসি কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ফরাসি 'মেনু' আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তারপর অর দ্য অভ্র, সূপ্, ডিম, ফিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

www.pathagar.com

২। তেতো :—

উচ্ছেভাজা, করেলাসেদ্ধ, নালতে শাক (ইন সীজন—মৌসুমী কালে)। এইবারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিজ্ঞেস করুন, আর কী কী তেতো আছে—আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে, তেতোটার খোলতাই নেই। পশ্চিমাঞ্চলে স্টাফ্‌ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া-করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা করি তার রেওয়াজ বাংলাদেশে নেই।

৩। ডাল :—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তারপর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, কেউ বা দু-চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দুভাগ—প্লেন এবং মেশানো, যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাঁটা; কিংবা আ লা নারকেল অর্থাৎ ডালে নারকোলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা :—

নিয়ে কিন্তু বিপদ। কারণ এতক্ষণ দিব্যি নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা নিরামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকারই হতে পারে।

অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো...

(খ) ডিমভাজা, মমলেট...

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা ...)

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো 'ডিম' এবং 'মাছের অনুচ্ছেদ' পুনরাবৃত্তি করতে হবে। 'ক্রস রেফেরেন্‌স' দিতে পারেন, কিন্তু ভয়, তাহলে 'মেনু' হয়তো জর্মন ডক্‌টরেট্‌ থিসিসের প্রকার এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবশ্য আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহামূল্যবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু তৈরি মালে তো ও-জিনিস ওতরালে চলবে না।

৫। ছেচকি—ছোঁকা—ছক্ক—চচ্চড়ি—লাবড়া (লাফড়া)।

এইবারে আমার পেটের এলেম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানি নে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনীকে অপটু ঠাওরালে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কসুর করি নে। আর পাঁচজন কান পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু-একবার যে কানমলা খাইনি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অনুচ্ছেদের মূল হেডিং নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী?

করে করে আসবেন, মাছ মাংস—তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য ছেদ, পদ, পদ-ভেদ—ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে—খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব : একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিন এবং রেস্তোরাঁর মেনুর কায়দায় একখানা বাঙালি মেনু তৈরি করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাঁজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশি কাগজ নিতে পারবেন না, কারণ পূর্বেই বলেছি মেনু থিসিস নয়। আবার শীটখানা যেন টায়-টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে

www.pathagar.com

চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেনু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভালো। কারণ 'কস্‌টিং' ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেস্তোরাঁ-ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

'একস্ট্রা' অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা...), আচার (আম, জারক নেবু...) ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

যে-কাসুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন ॥

www.pathagar.com

রন্ধন-যজ্ঞ

খবর এসেছে লন্ডনে এক বিরাট রন্ধন-যজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন সুস্বাদু রান্না পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাকে বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইন্ধন পুড়িয়েছি, আকাশের অ্যারোপ্লেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ—এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই তো আমি খেয়ে দেখেছি। তাও আবার দেশি বিদেশি নানা কায়দায়। জর্মন কায়দায় রান্না ভারতীয় 'রাইস-কারী' (অতিশয় অখাদ্য) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালি লেডিকেনি খেয়েছি (সের্ফ পেল্লাদ-মারা গুলি—প্রহ্লাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেদুইনের হাতে 'পাকানো' দিল্লির বিরিয়ানি খেয়েছি, জাপানির স্বহস্তে তৈরি চেঙ্গিসখানী কাবাব ভী খেয়েছি (এর নির্মাণকৌশল একদিন সবিস্তর নিবেদন করব—আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব!

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই, গুণীর আদর কি আর এ মূঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে?

লন্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টীম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বসু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালি, কাজেই বাঙালি হিসেবে, হে পাঠক, তোমার আমার দুজনেরই মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হল, এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন? কে না জানে, আজ বাঙালি সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি শনৈঃ শনৈঃ কমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের পাল-পারবে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য—অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যিখানে যদি বিশ্ব-রন্ধন-যজ্ঞে তিন বঙ্গরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালির ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অনুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হই নি।

আমি বাঙালি, আমি এই 'দেহলিপ্রান্তে' বসেও বাঙালি-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লিতে অতিশয় নিকৃষ্ট), সর্ষে বাটায় মাছের ঝাল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালির অন্যান্য রান্না নিয়েও আবার দম্ভের অন্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেরদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালি হেঁশেল দেখালেই চলবে না।

হাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালির সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালি বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোষ্টমের পাঁঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর দেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তারপর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই, মিহিদানা

www.pathagar.com

সীতাভোগ আরও কত কী! (মুদ্রাকর মহাশয়, আপনার জিভে জল আসছে, অথচ এ-লেখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তদুপরি আজকের দিনে আপনি আমি কেউই এসব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখি নে, অতএব অপরাধ নেবেন না।) এমনকি, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অম্বল, কিসমিস-টমাটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।

আর পিঠে—তার ফিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে 'ফেনসি-খানা' বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের—এমনকি, বাংলাদেশের ভেতরের লোকই যেগুলো জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজিতে যাকে বলে মাশরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাক্কা কদরদার, ভোজনরাজ ফরাসিও এর নামে অজ্ঞান, কিংবা পুব-সিলেটের 'চোঙা-পিঠে' (একরকম হাল্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝলসানো হয়, তারপর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আস্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা; খেতে হয় শুকনো মালই কিংবা করকরে কইমাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব!

শুঁটকি? নাক সিঁটকাচ্ছেন তো? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুঁটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন সব ভোজন-রসিকজনই 'স্মোকড্-ফিস' অর্থাৎ শুঁটকির কদর জানেন।

আরও কত কী!

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালি মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ সুচারুরূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না—এবং একদম পারে না মাংস রাঁধতে।

বাঙালি-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্-কো-অপারেশন করে বসে আছেন—এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন 'সোওয়াদ' আছে বলেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অখাদ্য।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালি রাঁধতে জানে না (বাঙালির উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অন্য জিনিস) অথবা মাংসে তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশ্‌ৎ, মটর-গোশ্‌ৎ, গোবি (কপি)-গোশ্‌ৎ বাঙালি বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাববাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শুনেছি—খাই নি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাববাড়ি এসব বস্তু সত্যই ভাল রাঁধেন। আর পারে উত্তম মুর্গী-ঝোল রাঁধতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালাসীরা; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস-রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দী জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে 'রাইস-কারি' খায়, সে রাঁধতে-বাড়তেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মুর্গী-ঝোল সে কখনও রাঁধতে পারল না!

www.pathagar.com

মাত্র একটি বাঙালি কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যিই মাংস রাঁধতে জানতেন। পাঁঠার মাংস কষে তিনি পেঁয়াজ-রশুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব 'মহাপ্রসাদ' রাঁধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো সুখাদ্য আমি এ জীবনে কখনও খাই নি। কিন্তু তিনি ব্যত্যয়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোনো ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ 'মহাপ্রসাদে'র সন্ধান পায় না। আমার মতো দু-একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের সুরুয়া (সূপ্), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুর্দা, কলিজা, তন্দুরীমুর্গী, মুর্গীমুসল্লম, মুর্গীশাহী, রওগন যুষ, তারপর মাংসে তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ৎ, গোবী-গোশ্‌ৎ, দইয়ে মাংস-মাখানো রায়তা-গোশ্‌ৎ, মাংস কুচি কুচি করে কোফতা, কীমা এবং তার থেকে কোফতা ঝোল, কীমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এককথায় আমরা বাঙালি যে-রকম মাছ দিয়ে পঁয়ষট্টি রকমের ভেল্কিবাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালি রমণীরা লন্ডনে এসব রান্না রাঁধবেন কী করে?

কিংবা পার্সীদের ধনে-শাক? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ পার্সীদের রান্না ইলিশ-মশালাও তো ফেলনা নয়। মাছটিকে ঠিক মধ্যিখানে লম্বালম্বি কেটে ফাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না, এর বাড়া কী প্রশংসা আছে বলুন?

গুজরাতীদের পতৌড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রিবেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মতো পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে 'রোল অপ' করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মতো মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখরোচক বস্তু এ-ভারতে কমই আছে। মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক।

মারাঠীদের দহি-ভাত। বেহারীদের আচার। তামিলদের মালে-গাটানি সূপ, রসম, ইডলি-ডোসে। কাশ্মীরীদের বসন্তঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব। পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লস্‌সী; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য 'অবদান'!

ক্রিকেট-টীমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই। ক্রিকেটে এগারো জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভালো ব্যাট্‌স্‌ম্যানই হোন না কেন। ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার, উত্তম উইকেট কীপার, এমনকি, না-ব্যাট্‌স্‌ম্যান না-বোলার সুদ্ধমাত্র ফীল্ডার (যথা ভাইয়া) দু-একজন রাখতে হয়।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে।

www.pathagar.com

'বাঁশবনে—'

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যেরকম প্যারিস, এশিয়া আফ্রিকায় সেইরকম তুর্কী। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয়—দিল্লী, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্।

প্যারিস গুর্মের কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া (কন্‌স্টানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন-রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশিদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি, তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজি আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি তো আর সিন্‌সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া আসেন নি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাইনি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে।'

একপ্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু...'

সবাই বললে, 'কিন্তু...?'

'পদ ছিল বড্ড বেশি।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ কখন বলে, 'ওহ্, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—'

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভালো রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই : সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনাকালে কি পঁচিশটা

www.pathagar.com

বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমার বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দসই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস অব উইনজার কখনও সূপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকি পদ মানুষ ভালো করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভালো পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্‌গী'—তদভাবে উস্টাস সস্+চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে একটি চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো+প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভালো করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন); এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।

তবে রেস্তরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তরাঁয় তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্। রেস্তরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভালো রেস্তরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্‌ল দোৎ (tuble d'hote) বা ফিক্‌স্‌ড্ দামে ফিক্‌স্‌ড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সূপ, (২) রোস্ট মাটন, (৩) পুডিং; আড়াই টাকাতে (১) সেলেরি সূপ, (২) বয়েল্‌ড ফিস, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি সূপ, (২) বয়েল্‌ড ফিশ্, (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম।

এই তাব্‌ল দোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ভোমকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশি। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। এই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন্ সূপ তাঁর বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বুকণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই-বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস হোটেলে তাব্‌ল্ দোৎও থাকত। ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তরাঁ যদি আবার উন্নাসিক, হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসি ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়তো খেতে দেখলেন

www.pathagar.com

আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন, 'কী বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, 'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে—'ভিনার স্নিৎসেল্'। 'স্নিৎসেল' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরেজিতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাংলায়, 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনও হদিস ওতে নেই। শুয়োরেরও 'স্নিৎসেল্' হয়, চীনদেশে হয়তো কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনিঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তাহলে গণ্ডারের 'স্নিৎসেল' খেতেন।

আমি ইংরেজি জানি নে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরেজিতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ' না-খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়োরের মাংস, এমনকি ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেনুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওয়া' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না।' কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভালো লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরেজি রেস্তরাঁ বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালির দুর্বলতা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যেসব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নিঘণ্টু যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্‌ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিল্‌টিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালি-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালি-রান্না একরকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এন্তার তফাত। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার

www.pathagar.com

ইজ সাউন্ড ইন্ এভ্‌রি পার্ট একসেপ্‌ট ইন দি হর্ন'—ঠিক সেইরকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'সুগার ইন্ এভরিথিং এক্‌সেপ্‌ট ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না একরকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিন্ডির 'শেফ'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে :—

(১) আফগানী নান্! কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্ রুটির (ফার্সীতে 'নান্' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্‌রুটি' তাই হুবহু পাঁউরুটির মতো, কারণ পর্তুগীজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মতো ক্রিস্‌প্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্যি 'চীজ্ অ্যান্ড বিস্‌কিট'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্‌প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়ার পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর (আভ্‌ন)-এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালোমতো রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ! আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবীদের এই 'তন্দুরা ফিশ' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্। এতে প্রায় কোনও মশলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন—ছুরিকাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশ্‌রী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্‌তা-নরগিস্ (অনেকটা ডেভিলের মতো) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই, তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাত্তাই মোগলাই রেস্তরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও রেস্তরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ পোলাও অল্প রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যাঁরা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণ মটনের হয়) খাবেন। দিল্লিওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহিওলা গোশ্‌ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাকওলা-গোশ্‌ৎ'— অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যেরকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফুর্জী, রওগন যুষ, শাহী কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, কটন কারি ইত্যাদি তো রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশি।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটর-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কী হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই সূপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। ভাবলেন মাছ, মাংস, আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সূপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসিরা বাইশ রকমের সূপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষে পদে। পুডিঙ কিংবা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথ-সেক্!!

www.pathagar.com

বাবুর শাহ

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হেয় প্রমাণ করে এদেশে শ্বেত (আমি বলি ধবল কুষ্ঠ) রাজত্ব যুক্তি ও নীতির উপর খাড়া করা। এককথায় যাকে বলে, 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' যে কী ভীষণ ভারি এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-আণ্ডা ঘোড়দৌড়ের জুয়োখেলা, খেঁকশেয়ালি শিকার করা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই 'নচ্ছার' দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবেসৈবে দু'একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভণ্ডামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন— 'বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইন্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্ক-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা হতভাগাদেরই ঘাড়ে!

কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি 'আপ্তবাক্য' নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলত, 'পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানত না—শুধু লড়াই আর লড়াই।'

অন্য দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবি, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজিতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু 'লড়াই আর লড়াই' নয় (আহা! তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মতো অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবি ফার্সী চর্চা করে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, 'ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে; সব রাবিশ!'

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজি 'শিক্ষিতেরা' এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছুদিন ধরে 'শেষ মোগলদের' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমি ভারি খুশি হয়েছি, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ পাঠক এই

www.pathagar.com

করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই ন্যাওটা একটি ম্যাট্রিক ফেল ছোকরা—কিন্তু র‍্যাপিড-রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনি-থ্রিলার পড়তে পারত—আমার কাছ থেকে রোম-সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আই ক্লাউডিউস' পড়ে এমনই 'ক্ষেপে যায়' যে, সে তারপর দুনিয়ার যত রোমান ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে, এস্তেক জুলিয়াস সিজারের 'ব্রিটন বিজয়' পর্যন্ত।

হালে বাবুর বাদশার আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদে। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুরের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চুগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্তানের তুর্কী; টার্কির (যার রাজধানী আঙ্কারা) ভাষা ওসমানলি-তুর্কী। আমার যতদূর জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথাবার্তা বলেছেন, উর্দুতে কবিতা লিখেছেন[১]—দিল্লির বিখ্যাত বিখ্যাত মুশায়েরায় (কবি-সম্মেলনে) দূত মারফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব)—এবং রাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুরের সেই আত্মজীবনী অনূদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরেজিতে ও বিবেচনা করি, এই বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরিজি থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমার নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশি জখম হয় গীতিরস, এবং বাবুরের সাহিত্যসৃষ্টি গীতিরসপ্রধান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুরের পর্যবেক্ষণশক্তি। ভারতবর্ষ—প্রধানত দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন বাবুর-বর্ণিত, কাবুল পাঞ্জশীর (পাঞ্জশীর অর্থ পঞ্চ-ক্ষীর, সংস্কৃত 'ক্ষীর' শব্দ ফার্সীতে 'শীর', কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাঞ্জ অর্থ পঞ্চ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী বয় : আমাদের পায়েসকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরঞ্জ (বিরঞ্জ অর্থ চাল)—ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে যাঁরা কাবুল দেখে ফিরছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তখৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাকে এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, বিশ্বপর্যটক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কী করেছিল?

---

১. 'শুনেছ, রাজা কবিতা লেখে, এ আবার কেমন রাজা!' এই বলে তখনকার দিনের ইংরেজ বাদশা-হাসলামংকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত। পরবর্তী যুগের এক জহুরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে দেখলেন, ঐসব বর্বর ইংরেজ জানত না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শা'র তুলনায় অতিশয় নিরেস।

www.pathagar.com

কল্পনা করতে পারেন, সেই নরদানব ইব্রাহিম লোদীর অন্তঃপুরের পুণ্যশীলা অসূর্যম্পশ্যাদের খোলাবাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল। এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।'

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপরে না ছিল আচ্ছাদন (একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরি অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালি ইনফ্লেশন কারে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোক্কা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালি তাই বাবুরের ইনফ্লেশন-জ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লি জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরা বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, 'এবারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবী করা যাক।' বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্দুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আণ্ডার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আষ্ট গণ্ডা (কিংবা ঐ ধরনের কিছু একটা—বইখানা আমার হাতের কাছে নেই)। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যি নিত্যি আণ্ডা খেতে চাইবে।

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালি পাঠক আনন্দ পাবেন সেটা ফার্সীতে লেখা বাঙলার (খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস। 'বাহারিস্তানে গায়েবী[২]—অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে-দেখে বাঙলার দেহলিপ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্যামল শ্যামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে।

২. বাংলা আজগুবি অর্থ—'আজ' মানে 'হতে' from; 'গায়েবী' মানে 'অজানা' 'লুপ্ত' 'অদৃশ্য' 'বিধিকৃৎ' অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অদ্ভুত।

www.pathagar.com

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কীরকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না। আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জন্য এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাস্যরসও আছে। এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশি, এবং তুর্কীতে খুবই কম। তুর্কীরা নাকি বড্ড বেশি সিরিয়াস। অতএব গোঁড়া। অতএব রসকষহীন।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে। কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃস্টান সকলেই জানতে চায় মহাপ্রলয় (আরবিতে কিয়ামৎ) কবে আসবে? সর্বধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই। একদা নাকি খৃস্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃস্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে। শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দানখয়রাতে উড়িয়ে দেয়।

১০০০ খৃস্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পস্তিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া ভালো। এখন ১৯৬৬। যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয় তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটু ভেবেচিন্তে দান-খয়রাৎ করেন।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে-সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ফিরিশ্‌তা (বাঙলায় ফেরেস্তা লেখা হয়: অর্থ এঞ্জেল, দেবদূত) জিব্রাইলকে (ইংরিজিতে গেব্রিয়েল) ডেকে আদেশ দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে। যে-কোনো একজন মানুষকে শুধোও, জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন? জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে একজন মর্ত্যবাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন। লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরকম বেফায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কী? আমার এসব জিনিসে কোনো কৌতূহল নেই, তবে যখন নিতান্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলেছি।' লোকটি দুই লহমা চিন্তা করে বলল, 'হু, ঠিক বলতে পারব না—তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে (আরবিতে ইংরিজির মতো he-র সম্মানার্থে কোনো 'তিনি' শব্দ নেই) এখন পৃথিবীতে। বেহেশ্‌তে নয়।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে উত্তরটা জানালে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো বহু সহস্র বৎসর। তার পর

www.pathagar.com

আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশি। বললে, 'কী আশ্চর্য! এখনো মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বাজে বেকার প্রশ্ন করে! হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ নেই। আচ্ছা...' এক সেকেন্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা আছে...,' ফের দু'সেকেন্ড চিন্তা করে বললে, পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই কোথাও—আমি চললুম।' জিব্রাইল বেহেশ্‌তে ফিরে এসে আল্লাকে সবকিছু বয়ান করলেন। আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর কেটে যাবে আরো কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর। আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে ধরাভূমিতে আসবেন। এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমতো চটে গেল—'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন...ইত্যাদি।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কাকুতি-মিনতি করাতে সে নরম হয়ে বলল, 'তাহলে দেখি! হুঃ, স্বর্গ নয়, পৃথিবীতে।' তারপর আরেক সেকেন্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও।' তারপর আরো দু'সেকেন্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য যে এরকম মস্করা করো। তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছ কেন? এবার জিব্রাইল সব খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহাপ্রলয়ের শিঙা বাজাতে।

কথিকাটির তাৎপর্য কী?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল জিনিস নিয়ে।[১] ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে স্বর্গে যাবে না নরকে জ্বলে পুড়ে খাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অনুসন্ধান করল না। এমনকি সৃষ্টিকর্তা আল্লা—দীন দুনিয়ার মালিক—যাঁকে পাবার জন্য কোটি কোটি বৎসর ধরে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব কল্পনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়ালখুশি মর্জি-মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। ফলে হয়তো বেরুবে শত শত আইষমান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

---

১. ইমাম গজ্জালী মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সূফী (রহস্যবাদী ভক্ত) ছিলেন। আরব্যোপন্যাস যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় সে-যুগের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্জালী তার রেক্টর (শেখ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি, তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দে) লোক শুধু প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

www.pathagar.com

*　　　　*　　　　*

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যদ্যপি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যসুন্দরের (অল্-হক্ অল্-জমীল) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনো বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌঁছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ, মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে জড়বাদে পৌঁছে যেতে পারে।

পয়গম্বর বলেছেন, "আল্লার থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।" সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব সত্য-জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীর্তিকলাপ কী প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আত্মহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয় : জ্ঞানানুসন্ধান নিত্যপ্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে :—

একদা শয়তানের রাজা, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সৎপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপর্যটক (জাহানদীদা) রূপে অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই-বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অনুচ্ছেদে এসে ধাড়ি বললে, 'কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার! আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে ওরাই আমাদের আদিম দুশমন।'

শাগরেদ ক্ষুদে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কী কথা! আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেনই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মূর্খ নিষ্কর্মারা বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাণ্ডা বোলায়। নিজে মৈস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ?

ধেড়ে হেসে বলল, 'খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কী হয় সেটা বোঝা যাবে পরশুদিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।'

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিক্যাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হপ্তার এলেম হাতেনাতে বাৎলাতে হয়। আমাদের ইস্টুডেন্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যেরকম সেটাকে 'শয়তানী' নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কর্ম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে 'সাধুমী' বলে গুরু কান মলে দেয় শিষ্যের।

www.pathagar.com

ধেড়ে আদেশ দিলেন, 'ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমন্‌স্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।'

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুনল। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিতপাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মতো চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম! না জানি, আজ কপালে কী আছে!

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দফে দফে স্মরণে আনল। তার পরে বিলজব্‌ব, ইব্‌লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্‌শয়াতীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! ধেড়ে, আণ্ডা, সব শয়তানকে লড়তে হয় ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূতের সঙ্গে—তাই ওঁদের চালচলন বেশভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ-যুগে হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিছু জর্মনদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্যের উর্দী। সেই উর্দী পরে তারা 'আক্রমণ' করে একটি জর্মন বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জর্মন সীমান্তে। সেই 'আক্রমণে'র ও 'আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্যে'র ছবি হিটলার বিস্ময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে পোলরাই প্রথম জর্মনি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইষমান, হ্যোস এঁরা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।[২] ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কী 'কৈশল' দেখাবেন!

বাচ্চা শয়তান ধারণ করল দেবদূত—ফিরিশ্‌তার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দারসৌরভ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপ্সরাবিনিন্দিত সঙ্গীত-নিক্বণ—সঙ্গে এসেছে বসন্ত পবনের মৃদু হিল্লোল মলয়ানিল-বিলোলানন্দোল্লাস!

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হল সাধুর। বললে, 'তোমার তপশ্চর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করো।'

বলা মাত্রই সে বুরাকের বেশ ধারণ করল।

বুরাক্ অনেকটা পক্ষিরাজের মতো। সর্বাঙ্গ অত্যুত্তম অশ্বন্যায় এবং উভয় স্কন্ধে দুটি পক্ষ।[৩]

---

২. অনেকে মনে করেন এ অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেধড়ক চড় কষায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলন্ড আক্রমণ করলেন না। না-হয় তিনি নিষ্ফলকাম হতেন। তাতেই-বা কী! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়া অপকর্মে (রুশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ!

৩. মুসলমানী ও পার্সী রেস্তোরাঁতে নাত্যুন্নাসিক হিন্দু পাঠকও এই ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই বুরাকে চড়েই সৃষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি; তার রুহ্, অর্থাৎ আত্মা গিয়েছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরেটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে চলতে ভয়ে বেপথু-কম্প্রমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না করে ফেলেন!

কিন্তু ধেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সবকিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচারনিষ্ঠ জন বড় দম্ভী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বসুখ আমি পাব না কেন?

এই দম্ভই তাঁদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।[৪]

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল বুরাকের স্কন্ধে।

তারপর কী হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাঁকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাঁকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহ্বরে।

সুশীল পাঠক। তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সজ্জনের এই অসদ্‌গতি হল কেন? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী-কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধোই।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিত্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।'

এবারে ধেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে,'ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান।'

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটি, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তাঁর মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের নেশায় তাঁর কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ?

পূর্ববৎ দেবদূত বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়াল। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানাল।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা (Moses), ঈসা (যীশু), হজরৎ পয়গম্বর—ব্যস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ 'প্যাকম্বর' নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্য ডেকে পাঠাবেন।

---

৪. কবি রবীন্দ্রনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে দম্ভ দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শঙ্করকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

'আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।'

সর্বত্যাগী শঙ্কর হিন্দুর উপাস্য। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের অন্ধানুকরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দম্ভ, সেই ত্যাগের luxury যেমন মূর্খ চেলারা করেন, কবি সেইটে এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

'বটে রে, ব্যাটা!' মনে মনে বললেন পণ্ডিত। 'মস্করা করার জায়গা পাও না! আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।'

সুহাস্য-আস্যে মৌলবী বললেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ! স্বর্গে যাবার জন্য তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এ যুগে বড় ভেজাল চলছে। কী করে জানব, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি, দেবদূতেরা মুআজিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

বাচ্চা শয়তান বলল, 'আপনি কী মিরাক্‌ল দেখতে চান, বলুন।' তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেল্লা ফতেহ্ করে ফেলেছে!

পণ্ডিত বললেন, 'শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সর্ব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার এই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?'

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে-মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অন্য কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানাননি বলে। তাকে তো অনায়াসে তিনি আরবিস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের সূর্য বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তন্মুহূর্তেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ল।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না, ব্যাটা বদমাশ। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাক্‌ল, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিলেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল : টায়ে টায়ে বদনায় সেঁটে যায়।

এবং চিৎকার :—

'গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উনুনটা। ব্যাটাকে আজ সেদ্ধ করে হালুয়া বানাব। ব্যাটা আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছে! শা—,হা—জা—,বা—।[৫]

হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে ব্যাপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়ল।

বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য সন্ধি-আপোস করতে চায়।

---

৫. পণ্ডিত মাত্রই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অশ্লীল গালাগাল দেন। 'তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন' আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষার 'বন্ধ্যাগমন' করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা!

www.pathagar.com

সন্ধির শর্ত হল, শয়তান এবং তস্য গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

*　　　　*　　　　*

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কী সম্পর্ক?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-ফাদার-দস্তুর সুদ্ধমাত্র প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

*　　　　*　　　　*

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমারো তাই। কী দরকার সেই মহা-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২/১০/৬৫

www.pathagar.com

'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'
'কটা ভাষা?' 'হা কপাল! বাঙলাই হল না।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে, এসব তর্কের ভিতর আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্ব-সংসারটা রিফর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্কন্ধে চাপান নি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করব। শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটিরিস্টিক—অর্থাৎ গল্পটি শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীর একটি বিশেষ স্থূলাঙ্গের ছবি।

'সুনন্দ' রাগে বিতৃষ্ণায় বিকৃতকণ্ঠে তাঁর জুর্নালে ইন্টারভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইন্টারভ্যুর রাজার রাজা 'অডিশনিং' নামক খাটাশটির দাঁত-ভ্যাংচানি দেখেছেন—ঈভন ফ্রম এ ভেরি লঙ সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা কারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক 'অডিশনিং' বোর্ডের কর্মকর্তা ছিলুম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ সুবাদে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করব।

একদা 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল' যবে যে, বড় কি ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই 'ভদ্র' নাম অডিশনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, 'বাজারে যাঁদের গ্রামোফোন-রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অডিশনিং-এর কী প্রয়োজন?' যাঁদের নেই তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাজাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন, ধরুন, এই লখ্নৌ শহরে ছোট-বড় তাবৎ গাওয়াইয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঙ্গি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখন চরমে তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখ্নৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্য-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, 'হ্যাঁ মিয়া, "আডিশনিং আডিশনিং" চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈঁ, সো ক্যা বলা?' (পাঠক, আমার উর্দুজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী!) মোদ্দা কথা,

www.pathagar.com

তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই আডিশনিং আডিশনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কী বালাই (আপদ, গেরো)।

শিষ্যেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে 'বালাইয়ের' জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপমানকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কী? ইম্‌তিহান্-পরীক্‌ষা দিতে তোমাদের কী আপত্তি? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতারের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসসৃষ্টি করতে পারব কি না, তার দিল ভিজিয়ে নরম করতে পারব কি না? সোজা কথায় বলতে গেলে, মহ্‌ফিলের সবাই প্রতিবারেই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বত্তা, তারা না বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতে কীই-বা এমন ফারাক?

শিষ্যেরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, 'মৈঁ' তো জাউংগা জরুর!'

শিষ্যেরা বজ্রাহত। আর্তরব ছেড়ে পাঞ্জাবি, যুক্তপ্রদেশি, বাঙালি, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আরজ্ করলে, 'আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পাঁ—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হুজুর?

হুজুর বললেন, 'য়েকীনান্—নিশ্চয়ই।'

শিষ্যেরা তখন 'ফারাম' 'form'-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রশ্ন আছে। ওস্তাদ বললেন, 'সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুডঢী বীবীকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না? ওসব বাদ দাও। ফারাম ভর দো।'

*　　　　*　　　　*

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাঁদের ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেন্ট নেই বলে শেষমেষ যদি সবকুছ বরবাদ-ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্য হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করত না।

লখ্‌নৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মতো খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর 'চ্যাংড়া'দের যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কতবার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিসটেন্ট কুলীনস্য কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু

www.pathagar.com

গুরুর পায়ে ধরে বসে আছে। এঁদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদের রুচির অভাব—ওপরওয়ালারা যারা সঙ্গীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।১

ছোকরা কর্মচারীরা তো তন্মুহূর্তেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল অডিশনিং রুমে—যেখানে 'পরীক্ষকরা' বেকার উকীলদের মতো অনুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিষ্ফল আক্রোশে আর্টিফিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কাণ্ড! যে-সব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেন্দ্রের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ায় প্রোগ্রামের জন্য ধন্না দেয় তারা পর্যন্ত আসেনি অডিশনিঙে—আর এই ওস্তাদের ওস্তাদ লখ্‌নৌয়ের কুৎব্‌মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিশ্বাস্য, বিলকুল গয়ের মুম্‌কিন্ তিলিস্‌মাৎ।

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্‌তিক্‌বাল (অভ্যর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চলন দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগলদ্‌ন্ (পিকদান) নিয়ে সামনে ধরল।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, 'সব যব্ জম্‌গয়ে তব কুছ্ হো জায়—' 'অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা! সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলত? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, 'কী গাইব?' তার স্বরে চিৎকার উঠল, 'সে কী, সে কী? গজব কী বাৎ! আপনার যা খুশি!' (সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিৎকুটে, অচেনা রাগ বৎখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া।)

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অডিশনিং বয়কট করে কেন্টিনে চা খাচ্ছিল তারা টাট্টু-ঘোড়ার মতো ছুটে এসেছে সঙ্গত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করেছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

---

১. প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান কর্তাদের নেকনজর পায়নি শুনে ভলতেয়ার সেই সঙ্গীতস্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সান্ত্বনা জানান, 'হায়, বড়লোকদের যে কোনও বড় হয়' (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সঙ্গীতাধিনায়ক। গাঁধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি তাঁকে ডেকে হুকুম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গাঁধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, বরদলৈ, উপবাস, সল্‌ট্-মার্চ-প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু 'কম্পোজ' করেন। বিহ্বল, প্রায়ান্ধ উদ্ভ্রান্তদৃষ্টি রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে আচমকা কলিশন। সম্বিতে এসে আমাকে দেখে করুণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, 'এ কখনো হয়?' আমি বললুম, 'আপনি যখন বাজান তখন আমার মতো সঙ্গীতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হেঁ হেঁ হেঁ সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিতী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আমেজ করছেন, এ দেশেই-বা হবে না কেন?' রবি শুধোলেন, 'করি কী?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'একটা বাবদ আমার মতো আকাটও একটা সাজেশন দিতে পারে।' 'কী কী?' 'ঐ সল্‌ট-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-নুন মাখিয়ে নেবেন।'

www.pathagar.com

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি। আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। যখন তালে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়ার কুন্তলদামে পরাবেন বলে।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশির ছটা! জান্‌টা যেন ফুর্তিতে ভরপুর! ক্ষণে সারেঙ্গীওলার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, 'ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ!' ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুঙ্কার দেন, 'শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন!' যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে! ওঁর কোনো কৃতিত্ব নেই।

গান থামল। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠল।

ইতিমধ্যে 'পরীক্ষক'দের একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরেদের কাছ থেকে অন্য সকলের অজানতে সেই 'ফারাম'খানা চেয়ে নিয়েছে। ঐটেতে পাস না ফেল, কোন্ হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সেসব লিখে দিতে হয়।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, সেখানে প্রশ্ন, 'আপনি কোন্ রাগ-রাগিণী জানেন?' তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ : 'তোড়ি'।

বিস্ময়! বিস্ময়!! এ কখনো হয়!!! পরশু দিনের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখত ডজন দুই। ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও কল্পনার বাইরে।

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাফ চেয়ে সেই 'পরীক্ষক'টি বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাসি হেসে, 'ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না?'

সকলের মুখেই প্রসন্ন মৃদু হাস্য। সারেঙ্গী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে-কোনো বিদ্যাতেই তোমার যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো—আমার জীবনে তাঁর উত্তরটি নিবিড় ঘন আঁধারে ধ্রুবতারার মতো জ্বলে—তিনি কী উত্তর দিলেন।

ঠণ্ডী সাঁস লে কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওস্তাদ বললেন, 'পচাস সালসে তোড়ি গা রহা হুঁ—অভী ঠিক তর্‌হসে নহী নিকলতী।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমতো বেরয় না। অন্য রাগ-রাগিণীর কথা কেন বৃথা শুধোও ॥

১৬/১০/৬৫

www.pathagar.com

চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ 'গ্যাগা'—এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। 'গ্যাগা' শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন্ বক্‌সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা 'গাগা,' 'গ্যাগো'. 'গ্যাগ্যা' গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে-কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্‌বেসাইল, ইডিয়ট, ('পন্টক' বললুম না, কারণ সুনীতিবাবু শব্দটির কপিরাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে 'কন্টক' থেকে 'কাঁটা', 'পন্টক' থেকে 'পাঁঠা' বের না করে আড়াল থেকে আমাকে 'পন্ঠক্' বলতে আরম্ভ করেছে), গোবর-গণেশ যে-কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেষোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মতো আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জনৈক অধ্যাপক[১] নাকি প্রকাশ্য সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডোকেলাস 'চোখের জলের লেখক'! আচ্ছা, পাঠক তুমিও কও, সেস্থলে তুমি কী করতে! শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন! শরৎচন্দ্র হাসান নি! সামাজিক নিষ্ঠুরতর কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি!—কাঁদাবার জন্য নয়, যন্ত্রণায় চিৎকার করার জন্য! ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাধিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরম্বু উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক্। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাথা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন 'দত্তা'র 'রাসবিহারী' চরিত্র আঁকেন, ঠিক তেমনি 'নারীর মূল্য'ও লিখতে জানেন। (আশা করি বলার প্রয়োজন নেই যে শরৎচন্দ্র এই অমূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্য লেখেন নি; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারব না; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার প্রাপ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হক্কও সঞ্চয় করতে হয়।)

---

১. যে-কোনো কারণেই হোক, বন্ধুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুধোই নি।

www.pathagar.com

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধভক্তে'র দল—ডেকে আন্ বললে যাঁরা বেঁধে আনে—(যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি) লাগলেন শরৎচন্দ্রের পিছনে। তার জের আজও চলেছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-'দলে'র না-ও হতে পারেন। তিনি হয়তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব বৃথা বাক্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি 'তুলনাহীনা' কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, 'বৃথা বাক্য থাক্'। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু আঁকুবাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মতো শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্য পাতা উল্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্ররূপী 'বউরূপী'র আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ইতিমধ্যে খড়ম পেটাতে পেটাতে (আহা, কী সুন্দর ছবিটি!) কটুবাক্য, 'খোট্টার ব্যাটারা কাঁঠাল পাকা দিয়া'—এবং সর্বশেষে পিসীমার সাতপাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল সময়োপযোগী সদুপদেশ—কাটা ন্যাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্য—সেকালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভলটের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পা না দি;—শরৎচন্দ্র যে বাঙলাদেশকে হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ-গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্কস্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদবাকি কুল্লে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিষ্ফল করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে 'সেব্রামীয়' টিপ্পনী কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিক পাঠানো যায় এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—থাক্, 'বৃথা বাক্য থাক্'। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অন্য একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসত, 'আহা বেচারা, কাল রাত্রে তার ছেলেটি—জানিস, কী হয়েছে?'—বাকিটা শুনতে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, 'কেন রে, কী হয়েছে?' 'টাইফয়েডে একটা চোখ গেছে।' আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিরা রান্নাঘরে ফিসফিস করে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে শুধব না, 'হ্যাঁ বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন?'

www.pathagar.com

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইব তারা এরকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠল কেন? অর্থাৎ হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

*　　　*　　　*

শরৎচন্দ্র 'চোখের জলের লেখক'? আর বিদ্যেসাগর? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যেসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি?—না? তাঁর 'শকুন্তলা' পড়তে পড়তে আমি হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন কেন, 'কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" বা "শকুন্তলা" হইতে কোনো একটি করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনোমতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।'

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দুখানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি! তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যাগা।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর চোখের জলের বইয়ের জন্য। অবতার বিদ্যাসাগরকে বাঙালি চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিদ্যাসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে যাঁরা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সেসব অনাচারের বিরুদ্ধে নাঙ্গা তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়, তখন আমাদেরই মতো জড়ভড়তদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।[২]

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসি মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিধর শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের 'তুলনাহীনা' লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যেরকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেইরকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোলার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

---

২. বিদ্যেসাগর ছদ্মনামে হাস্য—বরঞ্চ বলা উচিত ব্যঙ্গরসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সেজন্য নয়। বস্তুত তাঁর সেসব ছদ্মনামে লেখা পুনরায় 'আবিষ্কৃত' হয় বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

www.pathagar.com

এই পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য সেরাত্রে জোলার কোনোকিছু করার ছিল না। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়ল। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে বুড়ো হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ক্ষেপে! তখন লিখল 'জ্যাক্যুজ (Jaccuse) আই একুজ'। 'ফরাসি সরকারকে আমি একুজ করি।'

তারপর কী হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দুখানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক'বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে 'কাঁদানো'র লেখক জোলার কৃপায় ড্রাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।

শেষ কথা : বহু বহু প্রকৃত লেখক, 'চোখের জলের লেখক' নন কিংবা শুধু 'হাসাবার' লেখক নন। দুই-ই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই "অরক্ষণীয়া" মেয়েটি যখন পড়ি-মরি হয়ে 'সেজেগুজে' কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যাগা। আমি ষোল বছর বয়সে কেঁদেছিলুম।

৪/১২/৬৫

www.pathagar.com

বিষ্ণুশর্মা

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যেরকম ভারতের শঙ্খচূর্ণ[1] এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও বুদ্ধজীবনী বিক্রি করে। কিন্তু সে 'বুদ্ধজীবনী' কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অন্য নামে পরিচিত। আরবিতে বলে 'কলীলা ওয়া[2] দিম্‌না। এ দুটি—কলীলা ও দিম্‌না—দুই শৃগালের নাম। সংস্কৃতে করকট ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় ফেলতে চায়। বাইবেলের 'প্রাচীন নিয়মে' (ওল্‌ড টেস্টামেন্ট) হয়তো সেই কারণেই 'পেন্টাটয়েশ'=পঞ্চগ্রন্থ আছে। এদানিং আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহ্‌লেভি (সংস্কৃতে পহ্লভী) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্যের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানিরা গ্রিসের উপর বিরক্ত হয়ে (ফেড্‌ অপ্‌) পুবের দিকে মুখ ফেরালে। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অনুশিরওয়ানের[3] আমলে পহ্লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

---

১. এই শঙ্খচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্ববাঙলা থেকে এসে পশ্চিমবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শঙ্খের। শঙ্খ প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অন্যান্য খরিদ্দার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরিব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল (সোজাসুজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই) আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশি দাম দিতে রাজি ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শঙ্খ বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

২. কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই 'ওয়া'='অ্যান্ড'=এবং থেকে বাঙলা 'ও' এসেছে!

৩. এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

www.pathagar.com

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্যভাষায় লিখিত পুস্তক আর্যেতর ভাষায় অনূদিত হল,[৪] কারণ সিরিয়াক ভাষা হীব্রু, আরাময়িক ও আরবির মতো সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখত বলে পহ্লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি সম্মান পায়—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্লভীতে যিনি এ পুস্তক অনুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজ-বৈদ্য, অতএব সুপণ্ডিত। সিরিয়াকে যিনি তস্যানুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ-গ্রন্থ অনুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শনও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অনুবাদ করেছিলেন।

পহ্লভী অনুবাদটি লোপ পেয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াকে অনুবাদটি ("কলিলগ্ ও দমনগ্") এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় দুশো বৎসর পর—মোটামুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড়শো বৎসর পর—জনৈক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবিতে অনুবাদ করেন। আরবি সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আব্দুল্লা ইব্ন্ অল্-মুকাফফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের শৈলী বা স্টাইল শেখানো—বিশেষ করে যারা 'ব্যাল-ল্যাৎর্,' রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।[৫] পহ্লভীসিরিয়াক হয়ে আরবিতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনিই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অনুসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদ্বা বীদপা বীদপাই (আরবিতে 'প' অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অন্য দুই অক্ষর দিয়ে 'প' ও 'চ' বোঝাবার চেষ্টা করা হয়)। আরবি অনুবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীব্রু অনুবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক

৪. তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতীয় সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাফেলা [ক্যারাভান] ও চটির কথকদের [স্টরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, এমনকি প্রাচীনতম মোনজোদড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যেসব গ্রন্থ অনূদিত হয় সেও এ আলোচনার বাইরে।

৫. অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর ষোল পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজ 'দেশ' পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অনুকরণ করার মতো দম্ভ আমার কখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cultural Relations-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা, একখানা আরবি ত্রৈমাসিক ('সকাফৎ-উল-হিন্দ' 'ভারতীয় সংস্কৃতি') প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অনুরোধ আসে যে, যেহেতু অদ্যকার 'কলীলা ওয়া দিম্না' ও 'পঞ্চতন্ত্রে' প্রচুর তফাৎ, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে-কাজ সানন্দে প্রাগুক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

www.pathagar.com

ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্য এটি লাতিনে 'ডিরেক্টরিয়ুম ভিটো্যে হুমানো্যে' (অর্থাৎ মোটামুটি 'মানবজীবনের জন্য হিতোপদেশ'—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' যে সংশ্লিষ্ট সে-কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অনুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে 'বীদপাই-এর নীতিগল্প' বা 'কলীলা ও দিম্‌না' রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র,' 'হিতোপদেশে'র বিজয়যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন স্বর্গত ঈশান ঘোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে একসূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।' এ অনুচ্ছেদ ঈশান ঘোষ শেষ করেছেন এই বলে—'হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই[৬]।'

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে 'কলীলা ওয়া দিম্‌না' বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কপ্ট খৃস্টানরা (এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করে) কিছুদিন পূর্বে আরবিতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কপ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবি নাম 'সুৎরহ বার্লাম ওয়া য়ুআসফ'। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দু'জন খৃস্টধর্মে সেন্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও য়ুআদফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন অগস্ট (সেন্টস্ ডে)।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, 'য়ুআসফ' নাম এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ও 'বার্লাম' এসেছে 'বুদ্ধ ভগবান্'-এর 'ভগবান্' থেকে!

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক ॥

২/৪/৬৬

৬. ঈশান ঘোষের বাংলা জাতক কি জর্মন, কি ইংরিজি, কি হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপাণ্ডিত্যে আরেক ধনুর্ধর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয়নি। শুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমী স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি (বিধুশেখরের আলোচনাসহ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গৌড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

www.pathagar.com

এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুল্লুকে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়কট বা ধর্মঘটে যারা কালো ঝাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তত্ত্ব আমাদের কাছে নূতন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লিতে যে 'হাঙার স্ট্রাইকে'র জন্য প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্য শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিম্বুপানি—তদভাবে জিন্ (যদি তিনি মদ্যপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিনই সহজলভ্য কড়া ড্রিঙ্কের ভিতর জলের রঙ ধরে, আহারাদি, হ্যাঁ, আহারাদিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভোঁতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিশী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি 'এমেচার'!

এসব তো মস্করার কথা—যদিও দুটোই ডাহা 'ইমানসে' সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি 'সদাচার কদাচারে'র উৎপাতে এদানীং বড়ই উৎপীড়িত ('তংগ্ আ গয়ে'): তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে 'হাঙার স্ট্রাইক' করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে কিংবা 'হাঙার'-এর হাঙরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশন্‌ড হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ 'লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইক', 'ফাস্ট আন্‌টু ডেথ' এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং! আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এসব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যান্ডের কে যেন ম্যাকসুইনি না কী যেন নাম, সে নাকি বাষট্টি বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহান্ন দিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যই 'শরম্‌কী' থুড়ি 'লজ্জাকী, ঔর আফসোস—' থুড়ি পশ্চাত্তাপকী বাৎ!

তৎসত্ত্বেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রান্ড রাস্‌লের মতো নিরহঙ্কার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন।[১] স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে বড্ডই সুখ

---

১. এ বাবদে তাঁর বিদকুটে রায় : সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তত্ত্ব একবাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ফপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন্ দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ : তুমি এমেচার ঠোঁটদুটি সেলাই করে বসে থাকো। এমনকি কেউ যদি বলে, Fine Weather-eh? তুমি হ্যাঁ না বলতে পারবে না।

www.pathagar.com

পেতেন। আমি তামা-তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার কিরে কাটতে রাজি আছি, তাঁকে মধ্যমশ্রেণীর হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষগুণে শ্লাঘনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে হয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে! অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেষজ্ঞরা—একশ'বার মানি—কিন্তু যে বাঙলাভাষায় লিখেছেন সেটা, ওই যে ফরাসিতে বলে, 'ইল্‌জ এক্রিভ ফ্রাঁসে কম্‌লে ভাশ্‌ এস্‌পানিয়োল'—তেনারা ফরাসি লেখেন স্প্যানিশ গাইয়ের মতো।[২] রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাঙলাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু-পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্য তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দায়ে মজে যান। বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় সুনীতিবাবু এবং/কিংবা গোসাঁইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাঙলাভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ সুন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্‌ হুস্‌ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেন্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মতো পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দুম করে সম্বিতে ফিরে আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেসে ঘন ঘন করতালির মধ্যিখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন। কী বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দতাত্ত্বিক নন—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort)-ও বটে, দুর্বলতাও যদি অপরাধ না নেন—বটে, কিন্তু এস্থলেও তিনি যে-তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসস্যকেও হার মানায়। তিনি বলছেন, 'কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন (যেমন

তুমি ওয়েদারের জানো কী? প্রথম গ্রীনিজকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তাহা যদি বলে 'ফাউল' তবে ফাউল—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছ সেখানে থাক না মলয় পবন আর সূর্যাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ! এস্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয় তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিশির ভাদুড়ী বলতেন অ (ঘর-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ বারট্রান্ড রাসলের অনুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল-টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্বা' নাম রাখতে হবে।

২. আমার টায়-টায় মনে নেই তবে রাজশেখর লেখেন, 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরনীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভদ্রজনোচিত গলাখাঁকারি অনুমান করে নেবেন! ধন্যবাদ!) কোনো বেহেড্‌ বেলেল্লাপনা। উহু, আপনার পাপ মন, পাঠক, আপনার পাপ মতি। এর অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায়-টায় মনে নেই—The reaction of chlorine (কুলহরনীর) on acitylene (অসিতলীন) where nitrogen (নেত্রজন) is present.

www.pathagar.com

সেজানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোকরাটির হাত আজানুলম্বিত না বলে আগুলফ-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে 'রসোত্তীর্ণ' বলা হয়), ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দুই-পাঁচটি ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ (খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়।) এবং খাঁটি অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটেই আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে-পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের মতো নয়। সে-ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যুত্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈয়াকরণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসিভার অব স্টোলেন প্রপার্টি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো বৈয়াকরণিক, কোনো শব্দতাত্ত্বিকের সাহায্য পায় না। তাই, প্রাচীন লেখক—যখন নূতন শব্দভাণ্ডার বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দতাত্ত্বিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অন্য কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেচারি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি হঠাৎ আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠল, মুসলমানদের সন্ত ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন'ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিমধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় (মিনিট অব ডিসেন্ট) প্রকাশ করলে সেটিও সযত্নে পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠল, 'নগরে জুম্মার নমাজ অবশ্য পালনীয়; কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করব কিনা? ইমাম সাহেব, বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে "নগর" বলে কাকে, আর "গ্রাম" বলে কাকে?' জনৈক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন করে জনসাধারণের জন্য

www.pathagar.com

অনুশাসন প্রচার করি (অর্থাৎ আমরা theologians); থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্‌টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্‌টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয়তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরূদ্যান হয়ে হাজার লোকের কাফেলা (ক্যারাভান) কয়েক দিন বিশ্রাম করল। সেখানে জুম্মার নামাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিক্যাল অর্থে কোন্‌টা গ্রাম, আর কোন্‌টা শহর, তার সংজ্ঞার (definition-এর) জন্য কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোন্‌টা crime, আর কোন্‌টাই বা tort; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে। সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে, নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলাদেশে এখনো আরম্ভ হয় নি।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে। সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে। আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে। তাঁরা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষা-তাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে ॥

২৬/২/৬৬

www.pathagar.com

ভাষা

হাট-বাজার, শাক-সবজি.[১] দান-খয়রাত, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশি, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশি ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, মুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিকা (আরবি, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রু গয়রহ্), যেমন বাজার, সবজি, খয়রাৎ, দর্দ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থসূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কী প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজি প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃত দিই তবে ইংরিজি অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবি ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসনকর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবর্তার, হুজুর!—দেশ—' বলেই থমকে দাঁড়াল। ভাবলে 'হুজুর কি "দেশ" শব্দটা জানেন! হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'—ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষপর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়াল, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক "বাদশা" বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরিবের (গরিব আরবি), দুখ-দরদ্ (দরদ্, দর্দ ফার্সী) কে বুঝবে? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবি) ধনদৌলত (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়েছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক)-ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশি (খুশি ফার্সী) নেই। হুজুর অনুমতি দেন—ভাই-বেরাদর (বেরাদর ফার্সী) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

---

১. কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়, শাকান্ন, শাক মাছ অন্য সমস্যার অঙ্গ। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী হুজুর যা আমায় খাতির—'(বলেই থমকে দাঁড়াল: হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে দুশ্চিন্তায় পড়ল, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলামেশা করে এসব শব্দ শেখে নি—তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে)—'যত্ন—হুজুর যা খাতির যত্ন করলেন কী বলব। আবার দোকান (ফের মুশকিল—দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে "হাট" [হট্ট'] হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ।'

এ যুগে আবার ফিরে আসব। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, 'স্যার! আমি উকিল—(বলে থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যদ্যপি আসলে আরবি শব্দ, এদানির ইটি খাঁটি বাঙলা, স্যার কি বুঝবেন?—তাই হন্তদন্ত হয়ে বললুম) ব্যারিস্টার (উকিল-ব্যারিস্টার) লাগিয়েছিলুম, ঘটি (ঐ য্যা! স্যার বুঝবেন কি?) গেলাস (glass—এবার স্যর বুঝবেন!) ঘটি-গেলাস বন্ধক দিয়েছি—তেনাদের জন্য এরেক (ফের ইংরাজি 'ব্রান্ডি') ব্রান্ডি, বিড়ি-সিগারেট (দ্বিতীয়টা ইয়োরোপীয়) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই।'

এইসব বলে-কয়ে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম। প্রথমেই ঠাকুরমাকে পেন্নাম।

বললুম, 'ঠাকুমা' পরে সব গুছিয়ে বলব, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোটভাইটি নিয়েছেন ফ্ল্যাট (আবার সেই হাঙ্গামা—ঠাকুমা তো 'ফ্ল্যাট' বুঝবে না, অতএব বললুম) ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমাদের কাউকে না শুনিয়ে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী সুন্দর। এক্কেবারে ডল (dool—সর্বনাশ, ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে 'পুতুল' বলি)—পুতুলের মতো। কিন্তু হলে কী হয়! গুরু আছেন, ধম্মো আছেন। ব্যাস! এল তেড়ে টাইফয়েড-জ্বর (টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব 'জ্বর'টা বলতে হল); তুমি ভাবছ আমরা কিছুই করিনি। ডাক্তার (আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হবে) বদ্যি (ডাক্তার-বদ্যি) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবী ব্যাপার নয়। ইংলন্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশি হুজুরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলত, 'He is very meek and humble (meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ), Sir, but it is odd and strange (odd ইংরিজি, strange নরমান), that although we thought it meet & proper (meet ইংরিজি, proper নরমান) that we should search every nook and corner (nook ইংরিজি, corner নরমান), our sorrow

www.pathagar.com

and grief (sorrow ইংরিজি, grief নরমান) know no bound that we did not find him.'

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দেশি ও বিদেশি শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange; আমরা বাঙালিরা 'and' 'এবং' বসাই নি: আমরা বলেছি, হাসি-খুশি, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মুল্লুক।

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এরকম।

জল-পানি, বাজার-উটকো, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা, ইস্কুল-কলেজ অন্য ধরনের সমাস ॥

১২/৩/৬৬

www.pathagar.com

রবি-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূর্খ; কবিগুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না।' সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিতমানসে বলেছেন,

"মূরখ হৃদয় ন চেৎ, যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত"
"শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না"

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারব না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইমা পিক্‌টরিস্‌ কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস-এর যে-কোনো একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্বসমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘ্যাঁটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিম্বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেনস্‌ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরিজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব করতে ভালোবাসতেন কিনা, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কিনা, ডাইনিঙ-রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাঁটা দিয়ে ছিমছামভাবে সায়েবী কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাঙালি কায়দায় চটি ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন? কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কী করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায়

www.pathagar.com

তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্য ঝুলাঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নীচের তলায় তাঁর নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠল। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বুঝলি দিনু, আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশ টাকা ধার নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে, 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম।" সভায় যারা ছিলেন তাঁরা পয়েন্টটা ঠিক কী বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফ্‌টার অল্, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শত-দোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরুব্বীরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্ করেছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্যের কাছ থেকে ধার-নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারব না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্য চৌরঃ কবিজন নাস্ত্য চৌরো বণিক্‌জনঃ'—অর্থাৎ 'বড় বিদ্যাটি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেরই।'

তা হক। মহাকবি হাইনরিষ্ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে "নির্ভেজাল" অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল; আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালোভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে 'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী! অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানী বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে 'আইনস্টাইন-বোস থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ওটার নাম হয় হবে শুধুমাত্র 'বোস থিয়রি' নয় 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এ-সব অবশ্য আমাদের শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করত না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজোব বাজারে ছড়ায়—শান্তিনিকেতনের ইস্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠী ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইস্কুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই, তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই একপ্রান্তে লাইব্রেরি, অন্যপ্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরীর দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটল তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুনিয়ে ছুটল গুরুদেবের দিকে।

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মৃদু হাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কী একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদু হাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে একগাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, 'গুরুদেবকে কী দিলি?'

ভাণ্ডারে তার মারাঠী-হিন্দীতে বললে, 'গুরুদেব কৌন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কী রে, ও তো গুরুদেব হ্যায়!'

'ক্যা "গুরুদেব" "গুরুদেব" করা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।

বলে কী? মাথা খারাপ না বদ্ধপাগল? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে!

জিজ্ঞেসাবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামতো দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, এ একটি পুরী অঠন্নী!

চল্লিশ বছরের আগের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলে নি। কিন্তু ভাণ্ডারকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল, আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

www.pathagar.com

হেডমাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভাণ্ডারে, এ কী কথা শুনি?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, শেষপর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি? তোর মতো ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সক্কলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কীরকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি? আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল, কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয় নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?'

*　　　*　　　*

তার দু'এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠী সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছুদিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিক গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার ॥

www.pathagar.com

পুষ্পধনু

রস কী?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা রসের সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিংবা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কী, সৃষ্ট হয় কী প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যেসব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনও মিল নেই সে-কথা জোর করে বলা চলে না। এমনকি—শোনা কথা—বার্ট্রান্ড রাস্‌ল্ নাকি বলেছেন, গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতোই। কিন্তু এসব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কিসে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মতো বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক'টি কথা কইতে হল)।

রস কী সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকসহীন বিচার বিবেচনা যুক্তি তর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটি দ্বন্দ্ব লুকানো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলঙ্কারিকের অনটন হয় নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন মন্মট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনবগুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট

www.pathagar.com

বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্‌ল্‌ প্রশ্ন শোধান, রস কী, হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাস্‌ল্‌কে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাস্‌ল্‌ রীতিমতো হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেন নি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কী তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কী তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ গল্পচ্ছলে সবকিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেরকম কোনোকিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম!

বাগদাদের শাহ্‌ ইন্‌-শাহ্‌ দীনদুনিয়ার মালিক খলিফা হারুন-অর্‌-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা, সুন্দরী, খলিফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিণী,' অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতা-পাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, এটি তাঁরই হাতে তৈরি। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমনকি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। খলিফা হারুন-অর্‌-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলিফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এরকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারল না। সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলিফা কিন্তু দেখামাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বেয়ে দরদরধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলেছেন,'হায় আমি বাগদাদের খলিফা নেই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের

www.pathagar.com

আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমনকি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এস্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী=কবি; ফুলের তোড়া=কবিতা; ফুলের রঙ পাতার বাহার= তুলনা অনুপ্রাস, খোজা=প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিব্যুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না); এবং খলীফা=সহৃদয় পাঠক!

www.pathagar.com

নসরুদ্দীন খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নসরুদ্দিন খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহাআড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা'রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কীভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্', জর্মন 'বাখ' বা ফার্সী 'খবরে'র মতো,—কিন্তু 'হ' ভাগটা বেশি এবং 'সি' অক্ষরের উপরে হুক্ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেইরকম বাংলা শব্দ (আসলে আরবি) 'খারিজ' তুর্কীভাষায় haric লেখা হয়, অবশ্য 'হ'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কীতে 'সিয়াসত খারিজ'।

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে 'খোজা' হোকা হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের 'খোজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়ুকর-কে 'ফাদকর' 'ফদকর' লিখি, এমনকি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি, তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন; তাতে খবর এসেছে যে ঐদিন পাঁচশ' বছর পরে তুর্কীতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা-হা করে হেসে উঠেছে।[১]

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু'শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে!

এদেশে আরবি এবং ফার্সী চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরোআনা কবি দিল্লী ধাওয়া

---

১. VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES
Istambul July 22—Mount Soutlubiyan, in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Govemor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby, but there had been no serious damage yet.

www.pathagar.com

করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানাখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানী কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করত তাকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্তান
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে 'ইন্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কীভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কীভাষাতেই হত এবং তুর্কীসাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ তুর্কীভাষা মুস্তাফা-কামালের টার্কির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের মতো কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করে নি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুর্ক' বলতে মুসলমান বোঝাত এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরস্কম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালি বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে 'তুর্কী নাচন' নাচে।

আমরা ইংরিজি ফরাসি পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই—কিন্তু আশ্চর্য ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সে-দেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে-সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কীসাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[২]

২. 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার

www.pathagar.com

তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজবেক, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নস্রুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সবচেয়ে বেশি ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজি এনসাইক্লোপিডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপিডিয়া আকারে ইংরেজির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুট্টনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা যায়!

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু'আনা পরিমাণ কিংবদন্তি বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক'টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমনকি তিনি পাঁচশ' না সাতাশ বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আকশেহিরে তাঁর মক্‌বরহ্ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজিতে অন্ততপক্ষে বিশপ্) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি উদোর শিরনি বুধোর দর্গায় সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইক্‌ল্' খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন, ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হয়। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সেসব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা—সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যেভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময়, সদানন্দ, দরদী, ছবি তুর্কীদের

কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ৎ থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নস্‌রুদ্দীন খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেননি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবীরই ধারণ করবে, বিদেশির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশি খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্রভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু-পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধস্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সবকিছুই খোজার কোনো-না-কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রসসৃষ্টি করে যান নি—তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন-রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করেছেন তার সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়লস্য কুৎব্‌মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করেন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা একগাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চান নি, বা যেসব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মস্করা করতে চান নি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও আছে—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্‌ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ করে আর বলতে থাকে 'ঐ আমার প্রিয়া, ঐ আমার প্রিয়া', তাহলে পাড়ার ডন্‌ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

তবু না-হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কী?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে একটুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কী করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কী? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কী? রেসিপিটা যে পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে-ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মতো কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মতো দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশখবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজীর-ই আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্নসহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ ইন-শাহ, আপনার যে পূত পবিত্র... ইত্যাদি[৩] বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ্‌ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কী হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

---

৩. ইরানে বাদশার সামনে কোন্‌ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

www.pathagar.com

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মতো অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানি ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট—অমলেট নেই। কী ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজারপানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড।

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে-না-যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপি মার্বেলের ফোয়ারা, সরণ-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে, দু'একজন অমিতবীর্য সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায় নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি!

ইরানের বাদশা খুশিতে তুর্কীর খাস খলিফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন-মাসের ছুটি চান—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা আর কী করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন 'দোস্ত! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার'—বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজায় নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'মাসের কয়েকদিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণ হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ, হুজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুঁহু দুঁহু হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনোকিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

www.pathagar.com

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক্ক বেইজ্জৎ হলে মানুষ যেরকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জাঁহাপনা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সক্কলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসব।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্‌গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কী? কী? আমার যে তর সইছে না। আহ্, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্য এনেছি হুজুর।'[৪]

ঝঙ্কারের জন্য ফার্সীটা শুনুন :

'অগর্ আন্ তুর্ক-ই শিরাজী
বদস্ত আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওশ বখ্ শম্
সম্‌রকন্দ্ ওয়া বুখারারা।'[৫]

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

---

৪. ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজী অনুবাদ আছে—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand
I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight;
And bid these arms thy neck infold;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand."

৫. সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

www.pathagar.com

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখশির বর্ণন। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন! কী দোলন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতরকণ্ঠে বললেন, 'চুপ্', চুপ্', আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানে খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথমদিনের মতো তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা ব্-তাজা, নৌ-ব-নৌ,' দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মতো তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে-মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলাদেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাঁজা; দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্‌শেহিরে, স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন; কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ-দর্ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না-হয় হল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ-দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্থানে আছেই-বা কী, যাবেই-বা কী? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা-কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের কিছু নেই বলে। তিনমণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা—অন্যার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মতো? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বারকয়েক ঠুকলেন, এদিক-ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি করলেন।

www.pathagar.com

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারাওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, 'কী হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয় নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে?

একশ ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি না হয়!

মানে?

খোজার আখেরী—শেষ মস্করা। উইলে এইভাবে তৈরি করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখি নে।'

*　　　*　　　*

আমি আক্‌শেহির যাই নি। কাজেই হলফ খেয়ে বলতে পারব না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝব খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন-খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন।

www.pathagar.com

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ওঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেব রাখতে যাবে কে?

যার যেরকম খুশি, এর বেশি কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনো নূতন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যে-রকম নূতন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিক্‌স্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাঁবোর কাছে রবিঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস) এবং সম্পাদকমণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনার কাছে আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লন্ডনে রঙিন হওয়ার মতো রীতিমতো সঙ্কট-সঙ্কুল—রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে খতরনাক্—স্কন্ধোপরি যুগ্ম-শিরের প্রয়োজন!

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবিঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এঁদের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাঁবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ে'র মতো 'বরজলালে'র হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ভালো লিখতে পারেন,

www.pathagar.com

কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলাগারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতাই শ্রেয়— 'ভদ্রং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে।'

তুর্গেনেফের মন্দভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানি এবং ফ্রান্সে—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কীভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তেফ্স্কি তলস্তয় এমনকি কবি নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হয়। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমতো এঁদের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সে-কথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ-তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোন্‌খানে?

দস্তেফস্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোন্‌খানে। দস্তেফ্স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তস্তলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজপ্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণপ্রয়াস, কিংবা সে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত—এ সবকিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে এক্‌স্‌রে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলার এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্তেফ্স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে তার আর উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে! কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চা ঠ্যাং কামড়ে ধরে ডুব দেয় নদীতে, দস্তেফ্স্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানবচরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ-পঙ্ক দেখি তার প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কুমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা যোগাচ্ছে—কই, লোকটাকে তো খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোনো দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সবকিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মতো সৃষ্টি করলে

www.pathagar.com

কেন?' কিংবা হয়তো অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহ্যমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলি নে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে—কখনও-বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী এক অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সবকটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপনমনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাইনে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কীই-বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভানুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এতদিন ধরে লক্ষ্য করি নি কেন?' এর সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেফ্স্কির চাষা কভাস ভদ্কা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথর, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বার বার ভুলে যাই সে বাঙালি চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্নি নভ্গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই ওয়ার অ্যান্ড পীস্!

তুর্গেনেফ দস্তেফ্স্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধ হয় তুর্গেনেফ নখ্ শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়ক-নায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল চোখে; তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোমসের মতো আতশী কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়োরোর মতো তাকে

www.pathagar.com

ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোনো জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়ে নি। প্রতি মুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীনরূপে।

রুশদেশে পুশ্‌কিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তারূপে আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এ সব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুই-ই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুই-ই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্যফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রের কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্‌তেফ্‌স্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের উপর এ-রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনো বিশেষ রচনা হয়তো তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্‌তেফ্‌স্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোনো মুহূর্তে তার যে-কোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশিই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপপাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে। মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখেছেন, 'জীবনের সব কটি আনন্দের দিনও তো আমার এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

www.pathagar.com

এবারেও হয়তো তিনি কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তর হু(য়ু)গো, এদমোঁ দ গঁকুর, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়তো তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লবের গত হলে শোক নিবেদন করা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বঙ্কিমের মৃত্যুসংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে হয়তো সান্ত্বনার বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালি জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ। মপাসাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলীতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি-বা করে তাও তাঁর তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্যরচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধরা হয়, তবে সে-দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈলধারার মতো দ্রুতগামী বাক্যবিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসের সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

"রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশ-রূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।

"এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এরকম লোকের দেখা মেলে না।

"তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি; কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চপ্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজি হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোনো এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমতো আহত হয়েছিলেন। তাঁর সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

"আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ; তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

"প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

"দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রূপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রূপালী চোখের পলক আর বিরাট সাদা দাড়ি—

www.pathagar.com

সত্যই যেন খাঁটি রূপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরি। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। নাক চোখ যেন একটু বড্ড বেশি ধারালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভালো হয় যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

"অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মতো—বড় ভীরু-ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে, একটু আটকে যান, যেন ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসীতে কী হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তাঁর বচনভঙ্গিতে লাবণ্য এনে দিত।

"গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গিতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গির পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; একদিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সবকিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অন্যদিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যা-কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন এটা হল কী করে?

'সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সবকিছু বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যের সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীর একপ্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন অন্যপ্রান্তে প্রকাশিত অন্য ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে। তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে তার বিশেষ মূল্য পেত।

"তাঁর বয়েস হয়েছিল, তাঁর সাহিত্যজীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্লটের প্যাঁচ আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উপন্যাস তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু নয়, শুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসের উপাদান—তাতে প্লটের কলাকৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

"তাঁর মতে উপন্যাস আর্টের সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলাকলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নি। নানারকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এতদিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব শস্তা

www.pathagar.com

ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে, যাতে করে একদিন সে জীবনের ইতিহাসরূপে গণ্য হতে পারে।

"আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রুশ-সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্‌কিন্‌, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রুশদেশ যাঁদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি রুশকে দিয়েছেন চিরঞ্জীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি যার বিস্মরণ অসম্ভব; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব যে-গৌরবের মূল্য বিচার অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং রুশদেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্‌স্‌ বিসমার্ক তুচ্ছ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।"

www.pathagar.com

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষপর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রক্‌ফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়! বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কী করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্‌ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা!'

অজনদা আরো তৈরি মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কী একটা শুনে আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয় নি? বলেন কী মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্ত মনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্যকর্মে মন দিলাম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গীর।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি! এ আর নূতন কী শোনালি? প্রথম আমি পীরস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলী, তারপর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো ভালো। গুলমৃগীর! বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কৃচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান একফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে স্বর্গের দিকে ঠোঁটদুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড', করে কথা বলেন—অল্পই।

তার এসব কল-কায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা, গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘন্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন্। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক-স্টাটিসটিকস সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।'

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্' নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

'পার্টিশেনের বছরখানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কী একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্তেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কী পরিস্থিতি?"

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

www.pathagar.com

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, "সে কী রে! কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে!"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কী করে জানব? আমি পাষণ্ড বটি, —দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, "শোন্।

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়াল গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি; এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইন্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।"

আমি শুধলুম, "কেন?" তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম।"

দাদা বললে, "কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড্ প্রডিজি—ওয়ান্ডার চাইল্ড্—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।" দাদা আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।"

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইনসিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় "আকাশ-বাণী", "ঢক্ক-ডিংডমে" পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডমটা কী চাচা?'

'ডিংডম্ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি "টম্‌টম্" "টমটমিং" শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোনো :

দাদা বললে, "ভয়ংকর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে।-"

www.pathagar.com

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্ থাক্। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরি। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, বাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল এক দুশমন। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সারমর্ম এই : আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশি করতে পারো, যত খুশি তত আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্‌স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যান্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু'মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহে গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যান্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজার বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওয়ালাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশি বেশি হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সেসব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারব না—নির্যাসটি জানিয়েছিল গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরি। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরি করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, "গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—"

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেন ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠল। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার

www.pathagar.com

না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্‌স্ পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্‌টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কী নূতন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দুদিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যান্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাব, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানি বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল জাপানি বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ করেনসি নোট পুড়িয়ে ফেলবে। ভাইজাগা না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সেসব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায়নি । সরিয়ে ফেলছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি হয়।

আগেভাগে দিনক্ষণ দেখে অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে। "

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "কী বললে?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, "হ্যাঁ তা তো বটেই । 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীরকণ্ঠে তাকে বললে, 'জানিস , সিগারেট মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু'— সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কী তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক গে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড ! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যার মানুষ সেদিক হতে সরে যায়। আজ দেখি উল্টী বাৎ। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

www.pathagar.com

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আহ্, আহ্!' কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দুহাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক-একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আহ্—!' শব্দ। কেউ-বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটাল। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটল সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্‌তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু-একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরিব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়তো ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে। আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে! আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাৎ রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখে-মুখে কোনোরকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপী পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতন্যের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্প্রমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, 'তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ তাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কীরকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কীরকম বেয়াদবের মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

www.pathagar.com

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোন্‌টায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, আর টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।"

আমি বললুম, "দুটো জীপ না কচু!"

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন্। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না-হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম, "উড়তে!"

"হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশি।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষপর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশি ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্! তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

"আমি কিছু বলি নি।" দাদা থামলেন।'

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমসুল্-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কী চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কী হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব্‌ডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল্ গুল।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল। অর্থাৎ গুলের রাজা গুলম্‌গীর। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?'

www.pathagar.com

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জব্বর একখানা ব্রেকফাস্ট। শুধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠেই বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একখানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাস্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-ঘেঁষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফ্রুট দিয়ে। তারপর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগ্ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি-চাকতি কলা এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে টোস্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সময় পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তারপর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ) ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মতো—তারপর খাবেন এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া দুটো আণ্ডা ফ্রাই (আকারে এ-দেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোস্ট-মাখনের তবলা কখনো বন্ধ হবে না—এবং এরপর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরো খানচারেক টোস্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্‌স্!

ফরাসি-জর্মন ব্রেকফাস্টে খায় যৎসামান্য রুটি মাখন আর কফি। খানদানি ফরাসি মাখনও খায় না—বলে, ফরাসি রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চের বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসি-জর্মন করে গুরুভোজন।

রাত্রিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জর্মন খায় অত্যল্প। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠাণ্ডা, শুধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইরই কাণ্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সবকিছুই ঠাণ্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য যে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ, তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবের খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যেরকম ট্যুব থেকে টুথপেস্ট বের করি, এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনো ট্যুব থেকে মাস্টার্ড, কোনোটা থেকে টমাটো সস, কোনোটা থেকে মাছের পেস্ট। শুনেছি, দেখিনি, মাংসের পেস্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনো জিনিসের অভাব নেই। দামের পরোয়া ক'রো না, যত পারো খাও।

রাস্তায়ও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একখানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্‌স্ মিটেল গেশেফ্‌ট্—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারো বাড়িতে

www.pathagar.com

যাওয়া মাত্রই সে কোনো কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (হক্ রেনিশ) তাজা বিয়ার—ইস্তেক স্কচ্ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—খাক না বেচারীরা প্রাণ ভরে। এই যে সেভন ডেজ ওয়ান্ডার—তিনদিনের ভেল্কিবাজি—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়।

এ তত্ত্বটি জর্মনরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে-পাড়ায় থাকতুম সেটা শহরতলীতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাব'টি ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কী ভাবে, কী বলে পাবে না গিয়ে জানার উপায় নেই। গুণীজ্ঞানীরা কী ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গুণী-জ্ঞানী নয়; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কায়দামাফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর দুই পূর্বে এসেছিলুম মাত্র দুদিনের তরে। কোনো একটা পাবে যাবার ফুরসৎ পর্যন্ত হয় নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুধোল, 'কীরকম লাগছে পরিবর্তনটা?'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য! এত ধন-দৌলত যে কোনো জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখছিলুম তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিস্ট তার স্ত্রীকে বলছে, ফ্যান্সি! এসব জিনিস তারা এমেরিকান "এড্" ছাড়াই তৈরি করেছিল।'

আমি বললুম, "রাজরাজড়ারা ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেরকম সউদি আরব কুয়েৎ, বাহরেনে শেখরা জলের মতো টাকা ওড়ায়,—কিন্তু আর পাঁচজনের সচ্ছলতা কীরকম ছিল অতখানি আমি জানি নে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়ল। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরনে মোটামুটি ভালো স্যুটই, তবে ফিটফাট বলা বলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনো বুঝি নাৎসি যুগের গেস্তাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাহ্, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কী জানি কী করে তার গলার সুর বদলে যায়। এ তত্ত্বটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচাটন মন্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুধোলে 'কী দেখছ?'

আমি বললুম, 'এন্তের মোটরগাড়ি।'

www.pathagar.com

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের ক'জন সত্যি সত্যি মোটর পুষতে পারে জানো? শতেকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজ-রাজড়ারা ধনী ছিলেন, বাদবাকিদের কথা বলতে পারছ না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাবড়ে বেড়াচ্ছেন বাবুরা, এদের ক'জন মোটরের পুরো দাম শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টের ব্যাপার। জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—দে আর লিভিং বিঅন্ড দেয়ার মীনস্—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।'

আমি বললুম, 'সে কথা বললে চলবে কেন? কট্টর অবজেকটিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।'

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কে বলেছে ধনদৌলত বাড়েনি। বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনায় খরচ করছে অনেক বেশি। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিয়াদ।'

আমি বললুম, 'তাতেই-বা কী ফয়দা হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিয়াদও তো ঝুরঝুরে করে দিয়ে চলে গেল।'

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বারবার বলে, 'জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোল খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করেছিলুম, সে এতক্ষণ হাঁ-না কিছুই বলে নি। এবারে নিজের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়োর কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইনফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দুহাতে। এমনকি, যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।'

আমি বললুম, 'যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কী করে?' তারপর বললুম, 'ওহ্! বুঝেছি। ধার করে।'

বললে, 'ঠিক ধার করে নয়। কারণ, ধার করলে সে পয়সা একদিন-না-একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্রোক করে। কিন্তু ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টের কেনা জিনিসে সে-ভয়ও নেই। বড়জোর যে জিনিসটা কিনেছে সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যেই সেই ফিসফিস্-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, 'টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোক্কা টাকার কথা বলছি, ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্রোক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কী? বাড়ির তাবৎ জিনিসই ইন্‌স্‌ল্‌মেন্টে কেনা। সেগুলো তো ক্রোক করা যায় না।'

আমি বুড়োকে বললুম, 'আপনি সবকিছু বড্ড বেশি কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।'

www.pathagar.com

বুড়ো বললে, 'আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আডেনাওয়ারও তো ঐ পরশুদিন দেশের লোককে সাবধান করে দিয়েছে, "এ সুদিন বেশিদিন থাকবে না। হুঁশিয়ার, সাবধান!" পড়োনি কাগজে?'

আমি বললুম, 'অতশত বুঝি নে। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফুর্তিতে আছে। ঐটেই হল বড় কথা।' তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম, তাকে শুধোলুম, 'তোমাদের শহরের মধ্যিখানে যে হাজারখানেক সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্ ফর সেল্ দেখলুম, সেগুলো কি ইন্‌স্‌টলমেন্টে কেনা ছিল, আর কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পৌঁছেছে?'

বললে, 'নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ। বুড়ো আবার মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, 'তোমাকে বলিনি, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা!

*　　　　*　　　　*

সুবুদ্ধিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানি নে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারব না। আমি যা শুনেছি, সেইটেই রিপোর্ট করলুম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব 'পাবে' শুম্‌পেটার, কেইনস্‌, শাখ্‌ট্‌ আসেন না। আসে যেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দশের মুখ খুদার তবল।

www.pathagar.com

রসিকতা

হাসতে হয়, না-হেসে উপায় নেই। এমনকি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তে'র নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণ খুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গালগল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপেটোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি রসের গল্প মুখে-মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলাদেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানিস ভাই "প্রাভদা" কাগজ সবচেয়ে সেরা পলিটিক্যাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?'

প্রথম কম্যুনিস্ট : 'কুড়ি বচ্ছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টর্স, অ্যান্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ-চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আরেক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌ট্রিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস্? কেন?'

'কী আর হবে? দাঁতের চিকিৎসা করব কী করে? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজি হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে সব কর্তাব্যক্তিরা রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির উপর বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয়—চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সবচেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন, বাধ্য হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই এগুলো সম্বন্ধে হাড়ে হাড়ে এমনই সচেতন যে এ নিয়ে মস্করা করে তাই সবাই কিছুটা মনের ভাব নামাক—একটা নূতন অক্টোবর রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা না-ও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন

www.pathagar.com

সম্বন্ধে পোলান্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠরসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কীরকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরো তিনটি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মৃন্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সক্কলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমনকি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধোলে, 'কোথায় চললি কমরেড।'

'তুই যদি আমার পিছু না নিস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন-শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সঙ্গে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার সময়! ওদিকে যে রেশন-শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে।'

সত্যই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর নিত্যি-নিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবন্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কী বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কী? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদল করুন। ঢের কম হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস টিচার শুধোলেন, 'লেনিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছ?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীনদেশের—মন্ত্রীমশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, '১৯৬০-এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৬১-তে ৬০ গুণ। এ বছরে দুশ' গুণ—দাঁড়ান, কী হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিয়ো অ্যাসিস্‌টেন্‌ট একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি।'

তবে কোনো কোনো বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ গল্পটা হলদে, না লাল জানি নে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন, তোমার পাতলুন আর শার্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

www.pathagar.com

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরো পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মতো কাজ করছে তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাৎলে দেয় কীভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সক্কলকে হপ্তায় দুদিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মারবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো-দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব।]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোরবেলা— এদেশে যেরকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারি জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপারে নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশি বরদাস্ত করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলছে, 'কমরেড, অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা, 'কী বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।' কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশি আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবেদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরি হয় কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীনও খ্রুশ্চফকে গালাগাল দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন-চিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরণ-নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কী করি বল। সরকারপক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারি কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

www.pathagar.com

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সবচেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্য কাজ করতে।' সরকারি কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা, আপনি কী কাজ করেন?' 'আজ্ঞে আমি গোর খুঁড়ি।'

কিংবা,

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, 'রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কন্ডাক্টর : 'এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা "মশাইরা" নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দুজনা ওয়াক্ থুঃ ওয়াক্ থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনোপ্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজিতে বলে, 'নীরবতা হিরন্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহুশত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশি। ওদিকে হিটলার যেরকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলেন, তার দশভাগের একভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি-নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যতদূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলেও 'অন্তরে অন্তরে অন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কীভাবে আলাপ করে?'

'নিউইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা,

সরকারি কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনো আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা। তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্পদিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। একথাটা উভয়পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু

www.pathagar.com

হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়াবাড়ি নেই তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পুলিসকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাখারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডির অলঙ্কারগুলো লক্ষ্য করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, 'না কই, দে তো।'[১]

১. 'ভেল্টভখে'র (ৎসুরিখ) ১৪৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

www.pathagar.com

আড্ডা—পাসপরট্

'এত দেরিতে যে?'

শোনো কথা! আড্ডাতেও আসতে হবে পাঙট্যুয়ালি?

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো হচ্ছে। তুমি তো হামেশাই পাঙট্যুয়ালি অন-পঙট্যুয়াল।'

আড্ডা প্রতিষ্ঠানের কাশীবৃন্দাবন কাইরো শহরে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর গবেষণামূলক একাধিক গেরেমভারী প্রবন্ধ খানদানী অকসব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাত্মক বনেদী ত্রৈমাসিকে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল যে আমার ঐ সাতিশয় উচ্চপর্যায়ের লেখাগুলো যদি একবার তাঁদের কাগজে বেরয় তবে সে-কাগজের মান বা স্ট্যান্ডারড চড়াকসে এমনই সুপুরিগাছের ডগায় উঠে যাবে যে আর পাঁচজন লেখক যে মগ্ডালে উঠতে পারবে না। অথচ পয়লা নম্বরী পাঠকমাত্রই আমার উচ্চাঙ্গ লেখায় পেয়ে গেছেন তাজা রক্তের সন্ধান, হয়ে গেছেন ম্যানঈটার। সম্পাদকমণ্ডলী তখন আর পাঁচজনের লেখা বাসি মড়া পাচার করবেন কী প্রকারে! একবার ভাবুন তো, স্বয়ং কবিগুরু যদি কোনো সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় 'ট্রামেবাসে,' 'সুনন্দর জারনল' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' সব কটাই লেখেন, তারপর আমাদের তিনজনের—এককথায় সৈয়দ সুনন্দ করের কী হাল হবে? পচা ডিম ছুড়বে আমাদের মাথায় পাঠকগুষ্টি—কাগজ হয়ে যাবে বন্ধ। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, লেখক সবাইকে বসতে হবে রাস্তায়। আমাদেরও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে। ডাল-ভাত যোগাতে হয়।

আমার অত্যুৎকৃষ্ট রচনার মূল্য অকসব্রিজের কর্তৃপক্ষ বুঝুন আর নাই বুঝুন—এটা কিন্তু ভুললে চলবে না তারা ইংরেজ। ইংরেজ ব্যবসা বোঝে। নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন 'নেশন অব শপ-কীপারজ'—এখন বলা হয় 'নেশন অব শপ-লিফটারজ'[১] (ভদ্রবেশী 'দোকান-লুটেরা')। ব্যবসা বোঝে বলেই তারা আমার 'লা-জবাব' প্রবন্ধগুলো ইনশিওর করে সবিনয়, সকাতর ফেরত পাঠায়—ছাপালে তারা, তাদের আণ্ডাবাচ্চারা বেবাক-আণ্ডাহীন হবে সেই কারণ দর্শিয়ে।

তখন করি কী?

---

১. পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন : আশকথা পাশকথা (আড্ডার সেটা প্রাণধর্ম) না-শুনে যেসব বে-আড্ডাবাজ অথচ গুণী পাঠক মূল গল্পের খেই ছিনেজোঁকের মতো আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরা যেন ফুটনোটগুলো না পড়েন; কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অবশ্য তার অর্থ এও নয় যে, মূল লেখা না পড়লে তাঁর সর্বনাশ হবে।

'শপ-লিফটারজ' কথাটা ইংরেজের উপর প্রথম আরোপ করেন ছদ্মনামধারী সরস লেখক 'সাকী'।

www.pathagar.com

কথিত আছে, একদা লন্ডনে মারকিন হেনরি ফোরড দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন খাসা রহিসী রোলস রইস। পঞ্চম জরজ তাঁকে শুধোলেন, 'সে কী মিসটার ফোরড! আপনি বিজ্ঞাপনে বলেন "ফোরড গাড়ি দুনিয়ার চীপেস্ট এবং বেস্ট গাড়ি", তবে রোলস চড়েন কেন?' ফোরড বাও করে বললেন, 'আমার ম্যানেজারকে বহুবার বলেছি, আমাকে একখানা ফোরড গাড়ি দিতে। তার মুখে ঐ এক কথা—ফোরড গাড়ি তৈরি হতে-না-হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়; সে খদ্দের সামলাবে না মালিককে গাড়ি দেবে। খদ্দের মোর ইমপরটেনট দ্যান মালিক। অতএব, হুজুর বাধ্য হয়ে বাজারের সেকেন্ড বেস্ট্ মোটর—রোলস—কিনেছি।'

গল্পটি মিশরের পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন—যে পিরামিডের দিকে পিছন ফিরে আমরা কাইরোর কাফেতে বসি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল কাহিনীর ভালে ঐ তো চন্দন-তিলক! নিত্য নিত্য নব নব ফাঁড়া গরদিশে সাক্ষাৎ মুশকিলআসান।

আমি জানতুম, অকসব্রিজ ত্রৈমাসিকের পরেই সেকেন্ড বেস্ট্ কাগজ 'দেশ'। সেখানে পাঠালুম। ছাপা হয়ে গেল (সম্পাদক-ম্যানেজার হয়তো সোল্লাসে ভেবেছিলেন, ওটা পয়সা কামানেওলা বিজ্ঞাপন), বই হয়েও বেরুল। পাঠক সাবধান! চীনেবাদামের ঠোঙা কদাচ অবহেলা করবেন না। একমাত্র ঐ কাগজেই একখানা তাবল্লোক মল্লিখিত কাইরোর কাফে আড্ডা সম্বন্ধে নিবন্ধগুলি পড়তে পায়।

অতএব কাইরোর কাফে-আড্ডার সবিস্তর বর্ণনা নূতন করে দেব না। শুধু এইটুকু বলব কাইরোর কাফের তুলনায় আমাদের আড্ডা, ইংরেজের ক্লাব, জরমানের পাব, কাবুলির চা-খানা, ফরাসির বিস্ৎরো—এস্তেক অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর জমজমাট ঘাট—সব শিশু শিশু। বৈজ্ঞানিক বলেন, আমাদের জীবেনর এক-তৃতীয়াংশ কাটে শয্যায়—নিদ্রায়। কাইরোর কাফে হাসবে—কুট্টির ঘোড়ার মতো—আস্তে বলুন। তাদের জীবনযাত্রা একপ্রকার :—

সকাল ৬টা থেকে ১০টা কাফে=৪ ঘণ্টা। ১০টা থেকে ১টা দফতর। ১টা থেকে ২টা কাফে=১ ঘণ্টা। ২টা থেকে ৫টা দফতর, ৫টা থেকে ১২টা রাত কাফে= ৭ ঘণ্টা। ১২টা থেকে ৬টা ভোর নিদ্রাযোগে গৃহবাস অতিশয় অনিচ্ছায়।

একুনে, সর্বসাকুল্যে কাফেতে ১২ ঘণ্টা। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ না ঘণ্টা! হোলি রাশার সেই ফাটা ঘণ্টা যেটা কখনো বাজেনি।

কাইরো সজ্জনের জীবনের হাফ কাটে কাফেতে—অবশ্য বেটার হাফ-কে বাড়িতে রেখে! আর ছুটিছাটা, স্ট্রাইক—রাজা ফারুকের মেহেরবানীতে হরবকৎ লেগেই আছে[২]—লটারি উত্তোলন দিবসচয় যদি হিসেবে নেন তবে সেই প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তত্ত্বে ফিরে যাই :—বাড়ি নিয়ে কী গুলে খাব, পারেন তো দিন একটি ননস্টপ-আড্ডার সন্ধান। তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাইরোতে লোকে বাড়ি বানায় কেন? মিশরবাসী তখন বিদেশিকে বুঝিয়ে বলে, প্রাচীন যুগে

২. আমার কাইরো-কাফে আশ্রম ঐ সময়ে।

www.pathagar.com

তারা আদৌ বানাত না, বানাত গোরের জন্য স্রেফ পিরামিড—চোখ মেললেই এখনো চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে যুগের বাড়ি? বাড়ি বানানোর বদ-অভ্যাস বাজে-খরচা তারা শিখেছে হালে, ইংরেজের কাছ থেকে, তার 'হোম' নাকি তার কাসল (অ্যান্ড হি ইজ দ্য টাইরেন্ট ইনসাইড) আর বাড়ি বানানোটাই যদি এমন কিছু জব্বর মহৎকর্ম, বাবুইকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলা উচিত, ওর মতো নিটোল, নিখুঁত বাড়ি বানিয়েছে আর কেউ? ছাত ধসে না, ট্যাকশো দিতে হয় না।—ইত্যাদি।[৩]

তা সে থাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলুম, ঐ তো আড্ডার দোষ।

কাইরোর কাফে আমাকে বোঝাচ্ছিল, আমি পাঙট্যুয়াল, অর্থাৎ কথা দিয়ে থাকি ঘণ্টায় আসব বলে, আর আসি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ঘণ্টায় অর্থাৎ পাঙট্যুয়ালি....ইত্যাদি।

এরপর কাফে বলে কিনা, আমি নাকি অন্-পাঙট্যুয়ালও বটে!

সেটা কী প্রকারের?

টুটেনখামেন-এর আমল থেকে এদেশের অলিখিত আইন, মিটিং যদি ধার্য হয়ে থাকে সাতটায়, তবে শুরু হয় আটটায়, দিল-হামেশাই হচ্ছে। আমি নাকি উপস্থিত হই কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। এটা নাকি অন-পাঙট্যুয়াল পাঙট্যুয়ালিটি।

সেটা নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার একচেটে কারবার। নীলনদে কখন প্রচুর জল আসার ফলে কাফের সকলে গায়ে রেশমের স্যুট চড়ায়, কখন মাত্র কপ্নিনটুকু সম্বল; কখন সাহারায় ঝড়ের ঠেলায় ছ ফুট বালি জমে বাড়ির দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারই ফলে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিস্থিতি—কাফেতে আসার জোটি নেই—এসবের হদীসান্বেষীরা নাকি পরবর্তীকালে আবহাওয়া দফতরের ডিরেকটার জেনরেল হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের টার্ক—(তুর্কী বললে মানুষটাকে ভদ্র বলে মনে হয়)—ইংরিজি অর্থে টার্ক, সদস্য তওফীক এসে উপস্থিত।

পয়লা নম্বরের ধুরন্ধর এবং গোঁয়ার। আমাকে শুধোলে, 'কী বাবাজী, খানিকক্ষণ আগে তোমাকে দেখলুম এক আজব চিড়িয়ার সঙ্গে—ওহেন মাল কস্মিন্‌কালে বাবা, এই বহুতর চিড়িয়ার শহর কাইরোতেও দেখিনি! ব্যাপারটা কী?'

আমি বললুম, 'আর কও কেন? সেই কথাই তো এদের বোঝাতে যাচ্ছিলুম। সমস্ত বৈকেলটা কেটেছে ব্রিটিশ কনসুলেটে—বুনোহাঁস ধরার চেষ্টা কখনো করেছ? তাইতেই হেথায় হাজিরাতে দেরি?'

'বুনো হাঁস! সে আবার কী?'

'নয় তো কী? কিন্তু আমার সঙ্গে যে চিড়িয়া দেখেছিলে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন চীজ। আমার দেশের লোক।'

৩. ভারতের বাইরের বেদে মাত্রেরই বিশ্বাস তাদের আদিমতম পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তা হতেও পারে। এবং তাদের আর একটি বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আগাপাস্তলা বেদেদের দেশ, সবাই ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং কেউ বাড়ি-ঘরদোর বাঁধে না!

www.pathagar.com

কাফে অবাক। 'সে কী? আমরা তো জানতুম, তুমি কোথাকার সেই বাঙ্গলা না, কী যেন বলে, সেই দেশের একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া এসেছ এদেশে।'

'সে কথা পরে হবে। উপস্থিত শুধোই, বিদেশে-বিভুঁইয়ে কেউ কখনো পাসপর্ট্ হারিয়েছে?' সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলেন, কারো কপালে ঘাম দেখা দিল, কেউ-বা দেখি বক্ষ করে আল্লারসূলের নাম স্মরণ করছেন।

পাঠককে বুঝিয়ে বলি, এ সংসারে নানান ভয়াবহ অবস্থা আমরা দেখি, কাগজে পড়ি,—শ্রবণ বা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান না-হয় বাদই দিলুম। কিন্তু এ সবকটাকে হার মানায় মাত্র একটি নিদারুণ দুর্দৈব—বিদেশে পাসপর্ট্‌টি হারানো।

ছুটুন কনস্যুলেটে। তারা কানই দেবে না। লিখুন আপন দেশে। নো রিপলাই। কিংবা শুধোবে, পাসপর্টের নম্বর ইস্যুর তারিখ গয়রহ জানাও। সেগুলো আপনি ডাইরিতে টুকে রাখেননি। আবার কনস্যুলেটে ধন্না। সঙ্গে নিয়ে গেছেন দু-পাঁচজন ভারতীয়। তাঁরা হলপ খেলেন, আপনি যে ভারতীয় সে বাবদে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কনস্যুলেট বলবে, মাডাগাসকারের বিস্তর লোক ভারতীয় ভাষার কথা কয়; তাই বলে তারা ভারতীয়? ইনডিয়ান নেশনালিটির প্রমাণ কোথায় যে আমরা নয়া পাসপর্ট্ দেব? বের করুন ব্যর্থ সারটিফিকেট, এবং প্রমাণ করুন সেটা আপনারই।

হাজারোগণ্ডার হাবিজাবি হেনাতেনা চাইবে। এবং তাদের চাওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায্যতঃ হক্কতঃ। না চাইলে দুনিয়ার যত ভাগাবন্ড ভ্লাডিভসটক থেকে আলস্কা—এসে কিউ লাগাবে একখানা করকরে, ঝাঁ চকচকে, সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা ইনডিয়ান পাসপর্টের লোভে। এক ঝটকায় হয়ে যাবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল, সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে মহারাণীর মোলাকাৎ চাইবে। যে বেচারাকে টারক তওফীক দেখেছিল পথিমধ্যে, সে সত্যি সিলেটের লোক।

আমি গিয়েছিলুম কনস্যুলেটে, প্যালেসটাইন যাবার জন্য অনুমতির ('ভিজার') সন্ধানে। সেই জরাজীর্ণ লোটাকে জবুথবু হয়ে এককোণে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই বুঝে গেলুম লোকটা সিলেটি।

এবং তাই। আমার মুখে সিলেটি শুনে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে। আমি একপাল লোকের সামনে মহা-অপ্রস্তুত।

ব্যাপারটা সরল, কিন্তু পরিণামে হয়ে গেছে বেজায় জটিল। মাসখানেক পূর্বে আলেকজান্দরিয়া বন্দরের কিছু দূরে একটা জাহাজডুবি হয়—ঐ কোনো গতিকে বেঁচেছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, গায়ের চামড়াও কিছুটা পুড়েছে। পাসপর্ট্ তো সাপের মণি—রত্তিভর ডকুমেন্ট তার কাছে নেই। আর ঐ একমাত্র 'সিলট্যা' ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় একটি শব্দও সে বুঝতে পারে না।

কুল্লে কাফে মাথা নেড়ে সায় দিলে, ব্যাপারটা সঙ্গীন।

ভাগ্যিস, ডেপুটি কনসালটি ছিলেন আমার পরিচিত—অতিশয় অমায়িক খানদানী ইংরেজ ভদ্রলোক। আমার আপন কাজ শেষ হয়ে গেলে খালাসিটার কথা পাড়লুম।

www.pathagar.com

সায়েব মাথা নেড়ে বললেন, 'বিলকুল হুম্বগ্। আমি কলকাতায় কাজ করেছি পাঁচটি বৎসর। বাঙলা শুনলে বেশ বুঝতে পারি। ও যা বললে সে তো বাঙলা নয়।'

মনে মনে আমাকে বলতে হল, 'পোড়া কপাল আমার।' সাহেবকে বললুম, 'ওকে একটু ডাকলে হয় না?' সায়েব সদাশয় লোক, বললেন, 'আলবৎ।'

লোকটা আসামাত্রই আমি চালালুম তোড়সে সিলেটি। কিঞ্চিৎ কটুকাটব্যের কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে। উদ্দেশ্য তাকে একটু অতিশয় তাতিয়ে দেওয়া, নইলে যেরকম ন'সিকে ভিলেজ ইডিয়ট, পেটে বোমা মারলেও—। দাওয়াই ধরল। কাঁইকুঁই করে বলে গেল অনেক দুঃখের কাহিনী—চোখে সাত দরিয়ার নোনাজল। মিনিট পাঁচেক চলল 'রসালাপ'। সায়েব খালাসীকে বললেন, 'টুম্ যাও।' আমাকে শুধোলেন, 'এও বাঙলা'? আমি বললুম, 'লন্ডনের সঙ্গে উত্তর স্কটল্যান্ডের ভাষায় যে মিল—এ বাঙলার মিল কলকাত্তাইর সঙ্গে তার চেয়েও কম।'

এরপর সায়েব যা বললে, তার থেকে পরিষ্কার বুঝে গেলুম, লোকটি সত্যকার ডিপলমেট। বললেন, 'দু-একটা শব্দ যে একবারেই বুঝতে পারিনি তা নয়। তবে কি জানো, ব্যাবু, ব্যাপারখানা আসলে কী? কোনো বিশুদ্ধ স্ট্যান্ডার্ড ভাষা—যেমন মনে করো প্যারিসের ফরাসি, কিংবা ধরো লন্ডনে প্রচলিত খানদানী ঘরের ইংরেজি—সেটা শেখা কিছু অত্যধিক কঠিন কর্ম নয়। হাজার হাজার রুশ, পোল, হাঙগেরিয়ান চোস্ত ইংরিজি বলে খাসা ফরাসি কপচায়—কার সাধ্যি বলে কোন্‌টা কার মাতৃভাষা নয়—এবং প্রসঙ্গত বলি, এরাই হয় বেস্ট স্পাই। কিন্তু মশাই, বিশুদ্ধ গাঁইয়া ডায়লেকট রপ্ত করাটা বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। লন্ডনের কটা খানদানী ইংরেজই বলতে পারে খাঁটি ককনি?'

সায়েবটি ছিল একটু দুঁদে টাইপ। খালাসিটার জন্মভূমির গ্রাম থানায় চিঠি না লিখে রেডটেপিজেমের মূর্ত প্রতীক 'এনকোয়ারি' না করেই আপন জিম্মায় ছেড়ে দিলে একখানা পাসপর্‌ট্।

নইলে ঐ হতভাগা ক'মাস ধরে কে জানে, হয়তো বারো বছর ধরে আপিসে দফতরে ধন্না দিত, রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে করে বেড়াত, খেত কী, মাথা গুঁজত কোথায়?

আর ইতিমধ্যে যদি কোনো সমধিক কর্মনিষ্ঠ তথা অত্যুৎসাহী উৎকোচাশ্রয়ী মিশরি পুলিসম্যানের নজর পড়ে যেত? কাঁধে খাবলা মেরে শুধোত, 'তুমি তো বিদেশি বলে মনে হচ্ছে হে—নিকালো বাসবর' (আরবিতে 'প' নেই বলে 'ব' আদেশ, এবং শব্দটি আরবরা ফরাসি থেকে নিয়েছে বলে শেষের 'টি' উচ্চারিত হয় না—একুনে পাসপর্‌ট্ উচ্চারিত হয় 'বাসবর,' বা 'বাসাবর') তাহলে?

শ্রীঘর। তাতে যে আমাগো সিলট্যা মোতিমিয়ার খুব একটা ভয়ঙ্কর আপত্য (আপত্তি শব্দের সিলেটি রূপ) আছে তা নয়; জাহাজের কয়লাঘরের কারবালায় কারবার করছে যে লোক তার পক্ষে কাইরোয় কারাগার করীমা বব্‌খশায় বর হাল-ই-মা—আল্লার কৃপা তার উপরে এসেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু ততোমধ্যে তার নয়া বাসবরের জন্যে যেটুকু ধর্না দেওয়া, তদবির করা সেটুকুনই-বা করবে কে? অবশ্য আখেরে এস্থলে তদবির করা-না-করা—বরাবর বসুন্ধরা সর্বত্রই তদ্বীর-ভোগ্যা নন—এখানে প্রকৃতি তার আপন গতি নেয়।

সাঁইমুরশীদ কবুল, আমি স্নব নই। কিন্তু আপনার আমার মতো ক্ষীণকায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রসন্তানকে যদি বিদেশের জেলে ঠেসে দেয় তবে টেঁসে যেতে কতক্ষণ? না-হয় সপ্রমাণ হল, কাইরোর জেলকে আপনি হার মানিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরনো মাত্রই তো আপনি সেই ক্রাইমটি ফের করে ফেলেছেন, বিদেশে বিনা পাসপর্টে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশ্য আপনি তর্ক তুলতে পারেন, মিশর সরকারই আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে ক্রাইমটি করছে, সে-ই কাজের আপনি ইফেকট মাত্র। ততোধিক কুতর্ক করতে পারেন, আজ যদি মিশর সরকারের প্রতিভূ পুলিসম্যান আপনাকে চোদ্দতলা বাড়ির ছাদ থেকে পেভমেন্টে ফেলে দেয় তবে সেটা আত্মহত্যা নয়।

*　　　*　　　*

কাফেতে এ নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি হয়।

একমাত্র তওফীক আফেন্দী চরম অবহেলাভরা সুরে পরম তাচ্ছিল্যসহ মাঝে মাঝে বলছিল, 'যত সব!' কিংবা 'আদিখেত্তায় মানওয়ারী' অথবা ডিমের খোসায় কালবৈশাখী!

শেষটায় বললে, ছোঃ! আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?

নিবেদন করলুম, 'জানি তুমি একদা ছিলে মুস্তাফা কামালের 'বিবেকরক্ষক' অধুনা ইসমেৎ ইনেনুর অমনিবাস এমবেসডর, কিন্তু তথাপি—'

বললে, যাহ্ঃ! এইটুকু মশা মারতে বাঘের উপরে টাগ!—না। কিনে দিতুম। কী আর এমন ক্রেওপাতার গুপ্তধন প্রয়োজন ঐ সাসিটুকুর জন্য?'

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, 'সে কী? পাসপর্ট্ কি হাটের বেসাতি, যে—'

গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'দেখো, বৎস! তুমি আজহর মাদরাসার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করো; না-ই বা জানলে এসব জাল-জচ্চুরির কায়দা-কেতা।'

www.pathagar.com

কুট্টি

পুব-বাঙলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি সংখ্যা একলপতে গুয়াগাছের ডগায় উঠে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাঙলার উপভাষা শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোনো কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনো কোনো লেখক ওঠাননি। পুব-বাঙলার লেখকেরা ভাবেন 'করে' শব্দ 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়া সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গিতে না 'ইডিয়মে'—অবশ্য সেগুলো ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করতে হয়, যাতে করে সে ইডিয়ম পশ্চিম-বঙ্গ তথা পুব-বাঙলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে? অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতি খেলা যে polo খেলা সেকথা বাঙলা দেশের কম লোকই জানেন; (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ওৎরাবে না। আবার—

দুষ্ট লোকের মিষ্টকথা
দিঘল ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল
তিন-ই মন্দকারী।

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোনো বাঙলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম অর্থাৎ চটুল, শৌখীন, হয়তো বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লী, আগ্রা বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক।

www.pathagar.com

কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির-জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না-করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজনপরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজিতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুলরুম টু দি ওয়াইড ওয়ার্লড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিমবাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী, 'রমনা যেতে কত নেবে?'

কুট্টি গাড়োয়ান, 'এমনিতে তো দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী, 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি, 'আস্তে কন, কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাই নি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মতো কতকগুলো গল্প অবশ্যই কালাতীত, অজরামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশ নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন্ কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথী, অপটিমিজ্‌ম।'

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশিদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং সুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স-কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানি শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছটা

www.pathagar.com

বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকির খানি) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমীর আলী অ্যাভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখরখানী লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতোই পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনো কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে-রকম পশ্চিমবাংলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম যে-রকম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে। কিন্তু খরচের দিকে, একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে-ভাষা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালির সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটিভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, ইলাহি, বেলেল্লা, বেহেড্, দো গেড়ের চ্যাং—এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পুব-বাঙালির সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানতেই অনেক ঝাঁঝওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের রক্ আড্ডাতে পুব-বাঙালীর সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া বাক্যভঙ্গি বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস-ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এঁরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব আস্তে আস্তে ভদ্রভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সাহেবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলাসাহিত্যের

www.pathagar.com

সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল ভাসুর ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাংলা এবং সে বাংলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে-বাংলা বলতেন তার উপর বাংলাসাহিত্যের বা পুব-বাংলার কথ্যভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ-অধম এন্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালিই চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলিমশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিল ঘরের ছেলে এবং গল্পবলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের এক দিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে জলতরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্ টারালাপ্ করে, গাঙ্গুলি মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয় নি?

হায়, এ শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের উপর।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপাদেয় 'স্মৃতিমন্থন' আমারও স্মৃতির ভিজে গামছাটি নিংড়ে বেশ কয়েক ফোঁটা চোখের জল বের করল।

আমিও এ বাবদে একদা একটি প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য! ছাপাও হয়েছিল। এবং চাটগাঁয়ে প্রকাশিত একটি মাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আবার কোনো পুস্তকে সেটি স্থান পেয়েছে কিনা, মনে পড়ছে না।

আমার মনে হয়, কুট্টি সম্প্রদায় (ঢাকার গাড়োয়ান শ্রেণী) একদা মোগল সৈন্যবাহিনীর ঘোড়সওয়ার সেপাই ছিল। যার ফলে তারা 'কুঠি'বাড়ির ব্যারাকে থাকত। এবং তাই পরে এদের নাম কুট্টি হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজবাহিনীতে এদের স্থান হয়নি বলে, কিংবা মোগলের নেমকহারামী করতে চায়নি বলে এরা ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তাদের নিজেরই ছিল, এবং ঘোড়ার খবরদারী করতে তারা জানত। বরোদা রাজ্যেও আমি শুনতে পাই, সেখানকার কোচম্যানরাও নাকি পূর্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ক্যাভলরি অঙ্গে কাজ করত। ঢাকার কুট্টিরা এককালে উর্দু বলত, পরে ঢাকা শহরের চলতি বাঙলার সঙ্গে মিশে 'কুট্টি ভাষা'র সৃষ্টি হয়। তাই তারা এখনো 'লেকিন, মগর' এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে পুব-বাঙলার মৌলবী সায়েবরাও 'লেকিন, মগর' ছাড়া আরও বহু বহু আরবি

www.pathagar.com

ফার্সী শব্দ 'বাঙাল' কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকেন—ঐ অঞ্চলে হিন্দু পণ্ডিতরাও যেরকম গলায় ঘা হলে বলেন, 'কণ্ঠদেশে ক্ষত অইছে'। তাই শুনে মেডিকেল কলেজের গোরা ডাক্তার নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চীন দেশ হ্যায়, জাপান ভী দেশ হ্যায়, ফির কণ্ঠদেশ, কোন্ দেশ হ্যায়?'

বছর-পঞ্চাশেক পূর্বে ঢাকার এই 'কুট্টি' ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে ঐ আমলের কুট্টিভাষার উদাহরণস্বরূপ বলা হয় :

'করিম বক্স্‌কা মা নে আর রহিম বক্স্‌কা জরুনে এয়সা লাগিস্ লাগিস্তা কে এ ভি উস্‌কা বালমে ধরি টানিস্তা, উ ভী ইস্‌কা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা।'

অর্থাৎ 'করিম বখ্‌শের মা আর রহিম বখ্‌শের স্ত্রীতে এমন লাগাই লাগল (কোঁদল) যে এ ওর চুল ধরে টানে, ও এর চুল ধরে টানে।'

(কুট্টি ভাষার উদ্ধৃতিতে কোনো ভুল থাকলে যেন কুট্টিভাষাভাষী আমার উপর বিরক্ত না হন—কারণ কুট্টি গাড়োয়ান ছাড়া অন্য অনেক লোক এ-ভাষা বলে থাকেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চাতে আনন্দ পান। পূর্বে এঁরা সকলেই উঁচু সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। শুনতে পাই এঁদের কেউ কেউ নাকি ভাষা-আন্দোলনে বাঙলাভাষার পক্ষ নেন।)

*　　　*　　　*

'হাওয়া গাড়ি চইলা গেল গো
(আমার) বন্ধু আইল না।'

গানটি পুব-বাঙলায় রূপকার্থেও নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হাসন রাজার—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন (ধর্ম) ॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদ্‌বয় (সুগন্ধ, দুর্গন্ধ)
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয় ॥

এ ছত্রগুলি ব্যবহার করেন, সেই হাসন রাজারই একটি গান আছে, 'হাওয়ার গাড়ি ধু ধা করে চলেছে। (নিশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়ায় যে গাড়ি চলে অর্থাৎ শরীর) তার ভিতর সায়েব সোয়ারি (পরমাত্মা, আল্লা) বসে আছেন। হাসন রাজা (অর্থাৎ ব্যষ্টি পুরুষ) সেই সায়েবকে সেলাম করাতে (মর্মে মর্মে তাঁকে ভক্তিভরে অনুভব করাতে) তিনি হাসনকে আদর করে পাশে বসালেন।'

পুরো গানটি আমার স্মরণে নেই; তবে শেষের দু'ছত্র আছে—

'হাসন রাজা, নাচতে আছে, 'আল্লা আল্লা' ধরি।
পবনের গাড়ি চলতে আছে ধু ধু ধা ধা করি' ॥

এখানে পবনের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, শ্রদ্ধেয় বসু মশায়েরও হাওয়া গাড়ি মোটামুটি একই। তাই অর্থ দাঁড়ায়, 'পবনের গাড়ি' অর্থাৎ 'আমার প্রাণবায়ু' চলে গেল, তবু আমার বন্ধু এল না। বলাবাহুল্য পুব-বাঙলার ভাটিয়ালী গীত রচয়িতা এবং পশ্চিম

www.pathagar.com

বাঙলার বাউল উভয়ই কিছুদিন আগে পর্যন্তও অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত স্রষ্টা ছিলেন বলে নূতন নূতন জিনিস আমদানি হলেও তাকে সিমবল্, রূপক রূপে, এলেগরি করে মরমিয়া (মিস্টিক) গান রচনা করতেন। যেমন রেলগাড়ির ঘণ্টা বেজেছে (আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি বেজেছে), আমি যাত্রী ঘুমে অচৈতন্য (তমোগুণে আচ্ছন্ন) ইত্যাদি। বিজলি বাতি নিয়ে একটি গান আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে। হাওয়া গাড়ি প্রবর্তিত হলে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ 'মোতীফ' নিয়ে একাধিক গীত রচিত হয়।

*　　　　*　　　　*

প্রধানত রিকশার চাপে কুট্টি গাড়োয়ান সম্প্রদায় ঢাকার রাস্তা থেকে প্রায় অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত এরা নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করে গিয়েছে। অনেকেরই ভুল বিশ্বাস, এদের রসিকতার একটি প্রাচীন ভাণ্ডার ছিল এবং তারা শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই খায়, আমি যে শেষ রসিকতাটি শুনেছি, সেটি ১৯৪৭-৪৮ সালে নির্মিত।

আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকার এক আত্মীয়কে শুধোই, 'মুসলীম লীগ কীরকম রাজত্ব চালাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'সে সম্বন্ধে একটি কুট্টি রসিকতা বাজারে চালু হয়েছে। অত্যন্ত ক্যারাক্‌টিরিসটিক্—অর্থাৎ লীগের ক্যারাক্‌টার প্রকাশ করে। যদিও গল্পটি একটু 'রিস্‌কে'—অর্থাৎ গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে হয়।'

মুসলীম লীগ শাসনভার হাতে নিয়ে এক কুট্টি গাড়োয়ানকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন, সে যেন তার জাতভাইদের মধ্যে তাঁদের জন্য প্রচারকার্য বা প্রোপাগান্ডা করে। সে তাদের ডেকে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, 'ভাই সকল, শোনো (আমি এস্থলে কুট্টি ভাষার পরিবর্তে 'সাধুই' ব্যবহার করছি—লেখক)। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের মায়ের মতো। মাকে যদি খাওয়াও পরাও তবে মায়ের দুধ তুমি-ই পাবে। খাজনাটা ট্যাক্সোটা ঠিকমতো দাও; মায়ের দুধ তুমিই পাবে।' তখন এক ব্যাক্‌বেঞ্চার (হেক্‌লার) বলে উঠল, 'কইছ ঠিকই, লেকিন বাবা হালায় যে খাইয়া ফুরাইয়া দিল।' অর্থাৎ মিনিস্টার, পলিটিশিয়ানের দলই সব লুটে নিচ্ছে।... মুসলীম লীগ, আওয়ামী লীগ কারো প্রতিই আমাদের কোনো বৈরী ভাব নেই, তবে মনে হয়, গল্পটি বহু দেশ-প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে খাটে।

*　　　　*　　　　*

এই কুট্টি গাড়োয়ানদের সম্বন্ধে শেষ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

পার্টিশনের, পূর্বে ও পরে, কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্ব পিতামাতা নির্ভয়ে তাঁদের কন্যাদের কুট্টির গাড়িতে তুলে দিতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক এরা ঠিক সময়ে মেয়েদের ফের ইস্কুল কলেজ থেকে ফিরিয়ে আনত। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেলেও এবং শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে দাঙ্গার ফলে বাপ মা উধাও জানতে পেরে ভালো জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছে। কুট্টিরা এ জিম্মাদারীতে কখনো গাফিলি করেছে বলে শোনা যায়নি। এরা সত্যই শিভাল্‌রাস।

আর ঐ শিভাল্‌রাস কথাটা এসেছে ফরাসি 'শেভালিয়ের' থেকে। 'শেভাল' মানে ঘোড়া।

শেভালিয়ের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার। একদা খানদানী ফরাসিদের ছেলেরা এই ক্যাভালরি বা অশ্ববাহিনীর সদস্য ছিল। তাই বলছিলুম, কুট্টিরা আসলে মোগল বাহিনীর ঘোড়সওয়ার ছিল।

www.pathagar.com

দরখাস্ত

এই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র ঝাড়া তেরোটি বচ্ছর কাজ করার পর মিন্ নোটিশে চাকরি হারাল। টাইপ-করা একখানা কাগজ হাতে তুলে দিল, তার সারমর্ম—তোমাকে দিয়ে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই, কেটে পড়ো।

চৌদ্দ বছর পর চাকরি গেলে খুব আশ্চর্য হতুম না। কারণ আজকাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থ চৌদ্দ বছর। তারপর মুক্তি। ঠিক সেইরকম আমার এক ফরাসি-বন্ধু তাঁর সিলভার ওয়েডিঙের পরবে আমায় শুধোলেন, আমাদের দেশে, জেলে ম্যাক্সিমাম ক'বছর পুরে রাখে? আমি ঐ উত্তর দিলে তিনি বললেন, 'তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

আমি শুধালুম, 'কিসের থেকে?'

কড়ে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বউকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ওর সঙ্গে পঁচিশটি বৎসর বন্দি হয়ে কাটালুম। এখনো কি মুক্তি পাব না?'

উল্টোটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম—নিজে বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন—ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে। বললেন, 'বিয়ের চৌদ্দ বছর পর একদিন বউকে একটুখানি সামান্য কড়া কথা বলতেই যে ডান ভুরুটি একটু উপরের দিকে তুলে শুধোল, "ডার্লিং! তবে কি আমাদের হানি-মুন শেষ হয়ে গেল?" ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ঐ আমার আক্কেল হয়ে গেল। এরপর আর কক্খনো রা-টি পর্যন্ত কাড়িনি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর যমজ সন্তান হলে পর আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে "যে লোক মোমবাতির খর্চা বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুয়ে পড়ে তার যমজ সন্তান হয়।" ইংরেজ সেয়ানা; সঙ্গে সঙ্গে সক্কলকে একটা রাউন্ড খাইয়ে দিলে।

এ বাবদে আমাকে লাখ কথার সেরা কথা শুনিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি—তখন অবশ্য তিনি কাশীতে সাদামাটা অধ্যাপক—জুলুদের অভিধানে নাকি স্বামীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকার জংলী পশু যাকে স্ত্রী পোষ মানায়।'

এবং দুই এক্সট্রিম সদাই মিলে যায় বলে অভিজাত চীনাদের অভিধানে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'একপ্রকারের বন্যজন্তু যাকে সম্পাদক পোষ মানায়।'

গেল চৌদ্দটি বছর ধরে বঙ্গদেশের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চায় না। উত্তম শায়েস্তাপ্রাপ্ত কয়েদীকে জেলার ছাড়তে চায় না। বাড়ির এডা-সেডা করে দেয়—অথচ তাকে মাইনে দিতে হয় না।

www.pathagar.com

আমি কিন্তু মহারাণীর কাছে আপিল করেছি 'চৌদ্দ বছর পূর্বে ঠিক ১৯৫০ খৃস্টাব্দে আমার প্রথম বই বেরোয়। আজ ১৯৬৪, আমার ছুটি মঞ্জুর হোক।'

কুকর্ম করে মানুষ জেলে যায়। আমিও কুমতলব নিয়ে লেখক হয়েছিলুম।

সাধারণের বিশ্বাস, লেখকের কর্তব্য পাঠককে পরিচিত করে দেবে বৃহত্তর চিন্তাজগতের সঙ্গে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবে মহান আদর্শের পানে, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জেরোম কে জেরোমের ভাষায়, তাকে 'এলিভেট' করবে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'মাই বুক উইল নট এলিভেট ঈভন্ এ কাউ!'

লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমতলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ লাভ।

মহাকবি হাইনে একাধিকবার বলেছেন—তাই তাঁকে একাধিকবার উদ্ধৃত করতে আপত্তি নেই—'কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝেছি।' আমার বেলা তার চেয়েও সরেস। আমার হাতে অর্থ কখনো আসেনি। কাজেই মূল্য বোঝা-না-বোঝার কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। আমি চিরটাকাল 'খেয়েছি লঙ্গরখানায়, ঘুমিয়েছি মস্‌জিদে'; কাজেই বছরটা আঠারো মাসে যাচ্ছিল।

এমন সময় লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে যিনি পুষতেন তিনি আল্লার ডাক শুনে ওপারে চলে গেলেন। বেহেশ্‌তে গিয়েছেন নিশ্চয়ই; কারণ আমাকে নাহক পোষা ছাড়া অন্য কোনো অপকর্ম (গুনাহ্) তিনি করেননি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে ঈভনিং স্ট্যান্ডার্ডে বেরিয়েছে, ফ্লেমিঙের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'আন্‌অ্যাশেমডলি আই অ্যাডমিট—আই রাইট ফর্ মানি।'

এরপর যেসব পূর্বসূরিগণ নিছক অর্থের জন্যই লিখনবৃত্তি গ্রহণ করেন, তাঁদের নাম করতে গিয়ে বাল্‌জাক্, ডিকেন্স, স্কট্, ট্রলোপের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মি. কাউলি। তিনি তারপর আপন মন্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানে থেমে যাওয়া কেন?' বস্‌ওয়েলের লেখা যাঁরা স্মরণ রাখেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন, ড. জনসনও এ-বাবদে কুহকাচ্ছন্ন ছিলেন না, 'নিতান্ত গাড়োল (blockhead) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'—এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তার চেয়েও বড় গাড়োল যে, টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারলো না।

আমি ড. জনসনের পদধূলি হওয়ার মতোও স্পর্ধা ধরি নে; অতএব তাঁর মতো কটুভাষা ব্যবহার না করে, অর্থাৎ কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে, সেই অনুযায়ী কে পাঁঠা, কে গোলাপফুল সে আলোচনা না করে শুধু বলব আমি স্বয়ং লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

আমার বয়েস যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্। আর দেখ্, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করব।'

www.pathagar.com

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন; তদুপরি আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একদা উত্তমরূপেই জমিদারি চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন চলে যাচ্ছিল তাই বাগ্দেবীকে বানরীর মতো ঘাগরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচতে হল না। (এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অন্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া। বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥)

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। ১৯৩৮-এ গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন? উত্তরে কী বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কায়ক্লেশে চলে গেল ১৯৪৯ পর্যন্ত। লঙ্গরখানা (অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট-মস্‌জিদে) বন্ধ হয়ে গেল তখন; যেটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপ্‌রা কম্পজিস্ট রস্‌সীনি বলতেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপ্‌রা কম্পোজ করা ভিন্ন অন্য কোনো এলেম্ আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কম্পোজ করব কোন্ দুঃখে!' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি এই আপ্তবাক্যটি ছাড়েন। তারপর তিনি বোধ হয় আরো দুটি অপ্‌রা তৈরি করেন—একবার নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেকবার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

রস্‌সীনির তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ঐ এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পয়সা কামাবার মতো বিদ্যে আমার ব্রেন-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরি ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম। ফের চাকরি, ফের—ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজী' (পীপিং টম্—নোজী পার্কার) তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আমার চাকরি থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কী?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্ ফ্রম্ টাইম টু টাইম্)।'

ফরাসি শুধোলে, 'তাহলে চলে কী করে?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছো; আমি জবগুলো দেখছি।'

পেটের দায়ে লিখেছি মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা স্বেচ্ছায় না লেখার কারণ—

(১) আমার লিখতে ভালো লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাই নে।

(২) এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

www.pathagar.com

(৩) আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কি না, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যেরকম কোল্ড ব্লাডেড খুন হয়—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কি না?—শব্‌নমের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কি না, 'চাচা'টি কে, আমি আমার বউকে ডরাই কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মতো খাটাশ্‌টাকেও একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতায় ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতিমধ্যে আর কী করা যায়। এবং এসে রীতিমতো হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো সুপুরুষ সৌম্যদর্শন নাতিবৃদ্ধ এক ভদ্রজন লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন বাঁধিপোতার গামছা পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মতো লোম, মাথা-জোড়া-টাক—ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাতদিন খেউরি হয় নি বলে মুখটি কদমফুল,— হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!

আমি রীতিমতো নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গতবৎসর মে মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফৎ সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন—তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তারপরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দাদন শোধের জন্য।

আর কখনো লিখব না, একথা বলছি না। চাকরি গেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে।

www.pathagar.com

বনে ভূত না মনে ভূত

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, দেশ-বিদেশ তো অনেক ঘুরলেন, বয়সও হয়েছে, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি? সোজা বাংলায় ভূত, প্রেত, মামদো (মানুষ মরে ভূত হয় এটা ইসলাম অস্বীকার করে কিন্তু কোনো কোনো হিন্দুর বিশ্বাস "অয়, অয় Zানতি পারো না। মুহম্মদী মানুষ—অর্থাৎ মুসলমান— মরে গিয়ে মামদো হয়—মুহম্মদী শব্দ গ্রাম্য বাংলায় হয়ে গিয়েছে "মামদো"। এস্থলে Zানতি কথাটা ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হয়েছে—কারণ মামদো বলুন, ভূত বলুন, এনাদের তো চট করে চোখে দেখা যায় না—অতএব এনারা আছেন, ওনারাও আছেন, শুধু আমরা Zানতি পারি না) এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতবেজাতের ভূতের কোনো একটা আমি দেখেছি কি না?

জর্মন ভাষার দুটি শব্দ বাংলায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। একটা "কিন্ডারগার্টেন" আরেকটা—যদিও অতখানি চালু না—"রিন্ডারপেস্ট", পশুচিকিৎসক মাত্রই চেনেন। আরেকটি শব্দ প্রচলিত হওয়ার বড়ই প্রয়োজন—"পল্‌টারগাইস্ট"। ভুতুড়ে বাড়িতে যে দমাদ্দম ইটপাটকেল এবং মাঝে-মধ্যে কচুপাতায় মোড়া নোংরা বস্তুও বর্ষিত হয় সেটি করেন পল্‌টারগাইস্ট। "পল্‌টারন্" ক্রিয়ার অর্থ দুদ্দাড় দুমদাম শব্দ করা আর গাইস্ট=ইংরিজি গোস্ট (ghost)।

এর থেকে আরেকটা তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের যেখান থেকেই হোক না কেন, কোনো গুজব, জনরব—একুনে গুজোরব—পৌঁছনো মাত্রই সরল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই নয়া ভূতকে অবিচারে জাতে তুলে নেয়। ইংরেজের মতো অবিশ্বাসী (অনবিলীভিং টমাস) জাতও তাই তার দুশমন জর্মন জাতের পল্‌টারগাইস্টকে আলিঙ্গন করে আপন ভাষায় স্থান দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, যে-কোনো ইংরিজি দিকসুন্দরীর (যে সুন্দরী নারী দিক দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ ডিক্‌শনারী) আশ্রয় গ্রহণ করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। প্রেতসিদ্ধ কোনো কোনো গুণিন নাকি ভূতপ্রেতকে দিয়ে অনেক কিছু কাজকর্ম করিয়ে নেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্‌শাতে এঁদের সম্বন্ধে সবিস্তার তাজ্জব বয়ান দিয়েছেন। কোনো কোনো পীর সাহেবও নাকি এখনো এই অলৌকিক তিলিসমাৎ দেখাতে পারেন। শীতকালে বোম্বাই আম, যে-কোনো কালে কাবুলী মেওয়া পয়দা করতে পারেন।

দুঃখের বিষয় মহাকবি গ্যোটের সেই সুন্দর কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছি। যদ্দুর মনে পড়ছে তাতে এক চেলা পরিপূর্ণ ভূতসিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে

www.pathagar.com

আবাহন জানায়। তারপর কী একটা হুকুম করে—খুব সম্ভব জল আনতে—তারপর ভূত জল আনছে তো আনছেই, জলে জলে ছয়লাপ। ওদিকে বিপদ আছে কী, চেলা কিন্তু গুরুর কাছ থেকে শেষ উচাটন মন্ত্রটি যেটি দিয়ে ভূতকে ঠেকাবে, সেটি শেখার পূর্বেই চলে এসেছে। এখন বন্যার জলে ডুবে মরে আর কি!... শেষটায় কাতরকণ্ঠে সে গুরুকে স্মরণ করল। গুরু এসে এই ভূতকে অন্য হুকুম দিলেন, 'আমি এসব চ্যাংড়াদের গুরু। প্রথমে আমার মোক্ষম হুকুম শোনো। তারপর অন্য কাজ।' এই বলে তিনি ভূতকে অন্য হুকুম দিয়ে বন্যা বন্ধ করলেন।

কিন্তু এ-বাবদে আমাদের দেশে প্রচলিত গল্পটি এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো। সে-গল্পের গোড়াপত্তন ঐ একই। আমাদের গল্পেও গুরুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বেই চেলা তার ভূতকে আবাহন করেছে। ভূতের সঙ্গে তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। ভূতকে সর্বক্ষণ কোনো-কিছু একটা কাজ দিতে হবে। সে বেকার থাকতে পারে না। কাজ না দিতে পারলে সে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

অস্মদ্দেশীয় কাহিনীতে চেলা ভূতকে ডেকে বললে, 'আমার জন্য একটা রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দাও।' দু-মিনিট যেতে-না-যেতেই রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে তৈরি। ভূত বললে, 'তার পরের হুকুম?' চেলা তো তাজ্জব। তাড়াতাড়ি বললে, 'গোটা দশেক সুন্দরী রমণী।' ভূত কটমটিয়ে তাকিয়ে বললে, 'সে তো প্রাসাদে অলরেডি রয়েছে। বুদ্দু! হেরেম ভিন্ন প্রাসাদ হয় নাকি?' চেলা বলবে, 'তা হলে প্রাসাদের সামনে একটা হ্রদ তৈরি করে দাও।' এক মিনিটে তৈরি। ভূত শুধোলে, 'তার পরের কাজ?' চেলা তখন আরো মেলাই অর্ডার দিলে। সেগুলোও ঝটপট হয়ে গেল। আর প্রতিবারেই ভূত তার কাছে এসে কটমটিয়ে তাকায়। ভাবখানা সুস্পষ্ট। কাজ না দিতে পারলে শর্তানুযায়ী তোমার ঘাড়টা মটাস করে ভাঙব। চেলা তখন পড়েছে মহাসঙ্কটে। নূতন অর্ডার খুঁজে পায় না। কবি গ্যোটের চেলার মতোই সে ভূত বিদায় দিতে জানে না। তখন হন্নে হয়ে, না পেরে, কবি গ্যোটেরই চেলার মতো সে তার গুরুকে স্মরণ করলে।

এইখানেই আমাদের কাহিনী গ্যোটের কাহিনীর চেয়ে ঢের সরেস।

আমাদের গুরু তাঁর প্রাচীনতার, ফার্স্ট প্রেফারেন্সের দোহাই পাড়লেন না। চেলাকে বললেন, 'ভূতকে হুকুম দাও একটা বাঁশ পুঁততে।' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গুরু চেলাকে বললেন, 'এবারে ভূতকে হুকুম দাও, সে যেন ঐ বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। এবং উপরে ওঠা মাত্রই যেন নিচে বেয়ে নামে। ফের উপর। ফের নিচে। ফের উপর। ফের নিচ।'

গুরু চেলাকে কানে কানে বললেন, 'ঐ করুক, ব্যাটা অনন্তকাল অবধি। অবশ্য যখন তোমার অন্য-কিছুর প্রয়োজন হয় তখন তাকে ওঠানামা ক্ষণতরে ক্ষান্ত দিয়ে সে-কাজ করতে বলবে। তারপর ফের হুকুম দেবে, ওঠো নামো, ওঠো নামো।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

এ-গল্পের একটা গভীর অর্থ আছে।

www.pathagar.com

মানুষের মন ঐ ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষণ কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। ইংরাজিতে তাই প্রবাদ "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" অতএব যখন যা দরকার মনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়ে ফের তাকে একটা বাঁশে ওঠানামার মতো মেকানিকাল কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। মানুষ সর্বক্ষণ মনের জন্য নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি করতে পারে না।

এইবারে, সর্বশেষে আমি শান্তনু পাঠকের হাতে খাব কিল।

মহাত্মাজী চরকা কাটতেন।

রবীন্দ্রনাথ আপন লেখার কপি করতেন। গোরার মতো বিরাট গ্রন্থ তিনি তিন-তিনবার কপি করেছেন। যদিও ঐ মেকানিকাল কর্ম করার জন্য আশ্রমে লোকাভাব ছিল না।

আইনস্টাইন ব্যালা বাজাতেন।

www.pathagar.com

চুম্বন

ঘটনাটা সাচ্চা না গুল, হলফ করে বলতে পারব না, কিন্তু তাতে কণামাত্র যায় আসে না। রসের বিচারে সত্য না অসত্য, ভালো না মন্দ, প্রাকৃত না অপ্রাকৃত, এসব মাপকাঠি, কষ্টিপাথর সম্পূর্ণ অবান্তর। ডানাওলা অশ্ব অর্থাৎ পক্ষিরাজ ঘোড়া কখনো হয়?... রাক্ষসীই হয় না, তার উপর তার প্রাণ নাকি কোন্ এক সাত সাগরের অতল তলে কৌটোর ভিতর রয়েছে—ভোমরা রূপে। সেই ভোমরাকে চেপটে থেঁতলে না মারা পর্যন্ত ঐ রাক্ষসীর উপর যতই খঞ্জর-খাণ্ডার, বন্দুক-কামান চালাও না কেন, সে মরবে না। এইসব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে যখন ঠাকুমা রূপকথা বলেন তখন কি সর্বাঙ্গে শিহরণ কম্পন রোমাঞ্চন হয় না? মধ্যরজনী অবধি ঠাকুমাকে জাবড়ে ধরে বিনিদ্রাবস্থায় কাটে না?

হালে জনৈক পাঠক আমায় জানিয়েছেন, আমার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের শহ্‌র্-ইয়ার নামক রমণী বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজে কখনই থাকতে পারে না। এ চরিত্রটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য অবাস্তব হলেই যে রসের পর্যায়ে পৌঁছয় না, এ হুকুম দিয়েছেন কোন্ রসরাজ? তাহলে পূর্বোক্ত পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া, রাক্ষসীর কৌটোতে রাখা ভোমরা প্রাণ এসব কোনো প্রকারেরই রসসৃষ্টি করতে পারে না। ঐ অকরুণ পাঠক যদি বলতেন, "শহ্‌র্-ইয়ার বাস্তব হোক, অবাস্তব হোক, এটা রসের পর্যায়ে পৌঁছয় নি," তাহলে আমি চাঁদপানা মুখ করে সেটা সয়ে নিতুম। কারণ এটা রুচির কথা, রসবোধের কথা। আমার আরও পাঁচজন পাঠক-পাঠিকা রয়েছেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, "না; শহ্‌র-ইয়ার রসসৃষ্টি করেছে।" অতএব এ লড়াই করবেন আমার পাঠকমণ্ডলী। আমি শুক্তি বা ঝিনুক। আমার পেটে জন্মেছে শহ্‌র্-ইয়ার মুক্তো। জহুরীরা এর মূল্য বিচার করবেন। ঐ অকরুণ পাঠকের মতো কেউ বলবেন, "এটার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়।" আবার কেউ কেউ হয়তো বলবেন, "না হে না, অত হেনস্তা করো না। মুক্তোটা তো নিতান্ত হাবিজাবি বলে মনে হচ্ছে না।"

এই মতভেদের মাঝখানে দুই পক্ষের কেউই তখন বলবেন না, "ঐ ঝিনুকটাকে ডাকো না কেন? সেই-ই তো এটার জন্ম দিয়েছে। সে-ই বলুক, এটার দাম কত?'

বিচক্ষণ পাঠক, চিন্তা করো, সেই ঝিনুক, যে ইতিমধ্যে মরে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে, তাকে কোন্ মূর্খ নিয়ে আসবে নিউমার্কেটের জউরী বাজারে, কিংবা আমস্টারডামের মণিমুক্তোর মক্কা-মদীনায়? সে এসে ফাইনাল ফৈসালা করবে, মুক্তোটির মূল্য কী হবে! তাজ্জব কী বাৎ !!

www.pathagar.com

সহজতর উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয়, নেপোলিয়নকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সে-জননীই কি নেপোলিয়নের সর্বোত্তম জীবনী লেখবার হক্ক ধারণ করেন?

কিন্তু এসব কচকচানি থাক্। যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছিলুম সেইটে নিবেদন করি।

ইয়োরোপের কোনো এক বিখ্যাত নগরে মোকদ্দমা উঠেছে এক চিত্রকরের বিরুদ্ধে। তিনি একটা এক্‌জিবিশনে একাধিক ছবির মধ্যে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নগ্না এক যুবতীর চিত্র। পুলিস মোকদ্দমা করেছে, নগ্না রমণীর চিত্র অশ্লীল, ভালগার, অব্‌সীন, পর্নগ্রাফিক। এ-ধরনের ছবি সর্বজনসমক্ষে প্রদর্শন করা বেআইনি, ক্রিমিনাল অফেন্স।

আদালতের এজলাসে বসেছেন গণ্যমান্য বৃদ্ধ জজসাহেব, এবং জুরি হিসেবে ছ'জন সম্মানিত নাগরিক।

এককোণে সেই নগ্না নারীর লাইফ সাইজ তৈলচিত্র। তাবৎ আদালত সেটি দেখতে পাচ্ছে। দুই পক্ষের উকিলদের তর্ক-বির্তকের মাঝখানে হঠাৎ জজ-সাহেব চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলছেন, এ ছবিটা অশ্লীল নয়। আচ্ছা, তাহলে অশ্লীল ছবি কাকে বলে সেটা কি এই আদালত তথা জুরি মহোদয়গণকে বুঝিয়ে বলতে পারেন?"

চিত্রকর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই পারি, হুজুর। তবে অনুগ্রহ করে আমাকে মিনিট-দশেক সময় দিলে বাধিত হব।"

জজ-সাহেব বললেন, "তথাস্তু!"

চিত্রকর তাঁর উকিলের কানে কানে ফিসফিস করে কী বললেন সেটা বাদবাকি আদালত শুনতে পেল না।

সাত-আট মিনিট যেতে-না-যেতেই উকিলের এক ছোকরা কর্মচারী চিত্রকরের হাতে ছবি আঁকার একটা রঙের বাক্স তুলে দিল। চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নগ্না রমণীর ছবির সামনে গিয়ে রঙতুলি দিয়ে এঁকে দিলেন নগ্নার একটি পায়ে সিল্কের একটি মোজা।

জজের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হুজুর, এ ছবিটা এখন হয়ে গেল অশ্লীল!"

তাবৎ আদালত থ। জজ বললেন, "সেটা কী প্রকারে হল? আপনি তো বরঞ্চ মোজাটি পরিয়ে দিয়ে নগ্নার দেহ কথঞ্চিৎ আবৃত করলেন?"

চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এই কথঞ্চিৎ আবৃত করাতেই দেওয়া হল অশ্লীলতার ইঙ্গিত। এতক্ষণ মেয়েটি ছিল তার স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, নেচারেল নগ্নতা নিয়ে—যে নগ্নতা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নরনারী পশুপক্ষীকে ইহ-সংসারে প্রেরণ করেন। এবারে একটি মোজা পরে মেয়েটা আবরণ দিয়ে অশ্লীল সাজেশন্ দিল তার আবরণহীনতার প্রতি। এখন যদি কেউ এ ছবিটা দেখে মনে করে, কোনো গণিকা তার গ্রাহকদের লম্পট কর্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করার জন্য একটিমাত্র মোজা পরেছে তবে আমি দর্শককে কণামাত্র দোষ দেব না।"

চিত্রকরের বিবৃতিতে সম্মানিত জজ তথা জুরি-মহোদয়গণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি না, সে-কথা আমার মনে নেই, তবে আমার উনিশ বৎসর বয়সে—যে-সময় কিশোর

www.pathagar.com

মাত্রেরই হৃদয়ানুভূতি নারী-রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল, কবিগুরু যা অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকাশ করেছেন :

"বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল
আধো-জাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার আলোর দ্বন্দ্বে
যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য অসত্যের মাঝে
লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।"

সে বয়সে পূর্বোক্ত চিত্রকর-কাহিনী আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তার সাত বৎসর পর কিস্মৎ আমাকে নিয়ে গেলেন প্যারিসে। কারো দোষ নেই, আমি স্বেচ্ছায় গেলুম, এ জীবনের প্রথম 'ক্যাবারে' দেখতে।

বিশ্বাস করুন আর নাই-করুন, আমার সর্বপ্রথমই মনে হয়েছিল, এ কিশোরী যুবতীরা কী অনবদ্য সুন্দর স্বাস্থ্যই না ধরে! সুডৌল পরিপূর্ণ স্তনদ্বয়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না-মোটা-না-সরু যুগল বাহু, নাতিক্ষীণ কটিচক্র, পুষ্টনধর উরুযুগ এবং দেহের উত্তরার্ধের কুচদ্বয়ের সঙ্গে পরিমাণ রেখে তরঙ্গিত নিতম্বদ্বয়। আমি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল রমণী এবং অন্তত একটি মাস রাজপুতানী দেখেছি। এদের সঙ্গে আমি প্যারিসের 'ক্যাবারিনী'দের সৌন্দর্যের তুলনা করছি নে। আমি করছি স্বাস্থ্যের। সেখানে প্যারিসিনীরা বিজয়িনী।...এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। প্যারিসিনীরা যখন নাচছিল তখন তাদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী নাভিকে কেন্দ্র করে চক্রাধারে ঘুরে যাচ্ছিল। নদীতে যেরকম অতি ক্ষুদ্র দ'য়ের চতুর্দিকে স্রোতের চাপে ঘূর্ণায়মান আবর্ত সৃষ্ট হয়। ঠিক এই অদ্ভুত সৌন্দর্যটি আমি ইতিপূর্বে দেখেছিলাম একমাত্র রাজপুতানায়। সেখানকার কুমারীরা মাথার উপর দুটো-তিনটে জলে-ভর্তি ঘড়া-কলসী চাপিয়ে বাড়ি ফেরে। ওরা তো তখন হাঁটে না। যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। তাই ওদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে প্যারিসিয়ান নর্তকীদের মতো সৃষ্টহয় সেই দ', সেই আবর্ত। অপূর্ব সে দৃশ্য!

নমস্য চিত্রকর নন্দলাল, এই সচল ডাইনামিক চক্রাবর্তন তুলে নিয়েছেন এক অচল স্টাটিক ছবিতে। সেখানে সেই রাজপুতানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে খানিকক্ষণ তাকালেই চোখে ধাঁধা লাগে; মনে হয় নাভির চতুর্দিকে যেন চর্কিবাজী ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।... এই হল সার্থক শিল্পীর কলাদক্ষতা। সচলকে অচলতা দিয়ে, অচলকে সচলতা দিয়ে মূর্তমান করতে পারেন।

কিন্তু এ-বর্ণনা আর বাড়াব না। আমার বক্তব্য বোঝাবার জন্য নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই নিবেদন করি।

www.pathagar.com

ক্যাবারিনীদের পরনে ছিল উত্তমার্ধে অতি সূক্ষ্ম, প্রায় স্বচ্ছ, শরীরের মাংসের সঙ্গে রঙ-মিলিয়ে চীনাংশুকের গোলাপি ব্রাসিয়ের। অধমার্ধে ছিল কটিসূত্র—সোজা বাংলায় যাকে বলে ঘুনসি। সেই ঘুনসি থেকে নেবে গিয়েছে চার আঙুল চওড়া, ঠিক, আমাদের পালোয়ানদের নেঙট, অবশ্য সাইজে তিনগুণের একগুণ, আকারে ত্রিকোণ, এবং সেটি ঘুরে গিয়ে পিছনের কটিমধ্যে যেখানে ঘুনসির সঙ্গে গিঁঠ খেয়েছে সেখানে সে ঠিক ঘুনসিরই মতো একটি সূক্ষ্ম সূত্ররূপ ধারণ করেছ।

নৃত্যের সর্বশেষ দৃশ্যে ক্যাবারিনীরা তাঁদের ব্রাসিয়ের খুলে খুলে স্টেজের চতুর্দিকে ছুড়ে ছুড়ে ছড়াতে আরম্ভ করলেন।

এস্থলে এসে পাঠক আমাকে লম্পট ভাবুন আর যাই ভাবুন, হক্ কথা বলতে গাফিলী করবো না। যা থাকে কুল-কপালে!

এরপর আমি ভেবেছিলুম নর্তকীরা তাদের অধমার্ধের অঙ্গবাসও খুলে ফেলবেন। তা যখন হল না, তখন আমি আমার সঙ্গীকে শুধিয়ে জানতে পারলুম, আইনানুযায়ী স্টেজে সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বেআইনিভাবে গোপনে সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্যের ব্যবস্থার অভাবও প্যারিসে নেই।

এরা যখন নাভির নিচের কাপড়টুকু খুলল না তখনই আমার মনে হল—এবারে পাঠক নিশ্চয় বিস্মিত হবেন—এ নৃত্য এবারে হয়ে গেল অশ্লীল। আমার মনে হল, সেই চিত্রকরের আঁকা একটিমাত্র মোজা অশ্লীলতম ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এখানেও হুবহু তাই, বরং বলব অশ্লীলতর, অশ্লীলতম। এরা যদি একেবারে নগ্ন হয়ে যেত তবে এরা সেই চিত্রকরের নগ্ন রমণীর মতো (একটি মোজা পরানোর পূর্বে) হয়ে যেত সরল স্বাভাবিক নৈসর্গিক নেচারেল। এদের সেই একচিলতে দক্ষিণার্ধবাস তখন দিতে লাগল অশ্লীলতম ইঙ্গিত—চিত্রকরের মোজাটির ইঙ্গিত তার তুলনায় কিছু না।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এক নেটিভ স্টেটের জনৈক মহারাজা ভাস্কর্যশিল্পের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তিনি ইয়োরোপ থেকে অনেকগুলো প্রথমশ্রেণীর মূর্তির প্লাস্টার-কাস্ট নিয়ে এসে তাঁর জাদুঘরটি সত্যকার দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান করে তুলেছিলেন। কিছু কিছু মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন—পুরুষ রমণী দুই-ই। একদিন মহারানী গিয়েছেন সেই জাদুঘর দেখতে। তিনি তো শক্ড্। হুকুম দিলেন নগ্নমূর্তিগুলোর কোমরে গামছা বেঁধে দিতে! পাঠক ভাবুন, রোমান মূর্তির কোমরে (বাঁধিপোতার?) গামছা! সে কী বেঢপ দেখতে! কিন্তু এহ বাহ্য।... অজ পাড়াগাঁয়ে লোক, সে-শহরে এলে চিড়িয়াখানা এবং এই জাদুঘরটিও দেখতে আসত। এক ছুটির দিনে আমি জাদুঘরের এটা সেটা দেখছি,—এমন সময় একটি গামছা-পরা মূর্তির সম্মুখে তিনজন গামড়িয়া—চাষাই হবে—আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি গুড়িগুড়ি তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং নিম্নোক্ত সরেস কথোপকথন শুনতে পেলুম।

প্রথম চাষা : "মূর্তিটার কোমরে গামছা কেন?" (আমি বুঝলুম, ঐ অঞ্চলের একাধিক মন্দিরে নগ্নমূর্তি দেখেছে বলে এ-প্রশ্নটা তুলেছে।)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় চাষা : "শুনেছি, মহারানী নাকি ন্যাংটো মূর্তি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরই হুকুমে গামছা পরানো হয়েছে।"

পূর্ণ এক মিনিটের নীরবতা। তারপর—

তৃতীয় চাষা : (ফিসফিস করে) "মহারানীর পাপ মন।"

আমার এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করেন, ঐ জাদুঘরের ধুরন্ধর পণ্ডিত জর্মন উচ্চতম কর্তা! জাদুঘরে গাঁইয়াদের ভিড় লাগলেই তিনি তাঁর একাধিক কর্মচারীকে নিযুক্ত করতেন ওদের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ছবিমূর্তি সম্বন্ধে ওদের টীকাটিপ্পনী শুনে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।... এ-দেশ ছাড়ার সময় তিনি আমাকে বলেন, "শহুরেদের তুলনায় এদেশের জনপদবাসীদের সরল স্পর্শকাতরতা অনেক বেশি। এরা যেমন কালীঘাটের পট দেখে আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় মডার্ন ছবি দেখেও সুখ পায়। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, গগন ঠাকুরের কিউবিস্ট ছবিও এদেরকে হকচকিয়ে দিতে পারে না। তবে এগুলো সম্বন্ধে মতামত দেবার পূর্বে—এবং আকছারই লোহার উপর হাতুড়িটি মারে মোক্ষম—অনেকখানি চিন্তা করে তবে বলে। আরো একটা মোস্ট ইনট্রিসটিঙ এবং ক্যারাকটেরিস্টিক ফ্যাক্ট—এরা থ্রী-ডাইমেনশনাল, রিয়ালিস্টিক, রঙিন ফোটোগ্রাফের মতো ছবি বাবদে উদাসীন (যেগুলো শহুরেরা পছন্দ করেন)। এই হল আমার কর্মচারীদের রিপোর্ট।" অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কারণ, হা হতোস্মি, এই কর্মচারীরা অন্যান্য শহুরেদের মতো পছন্দ করে রঙিন ফোটোগ্রাফের মতো ছবি।

আমি শুধালুম "নিউড?"

হ্যার ডিরেক্টর তাজ্জব মেনে বললেন, "নিউড? এসব গ্রাম্য লোক সুস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করে। উত্তম বলদের সঙ্গে জাতগাভীর সম্বন্ধ করায়। পথেঘাটে-কুকুর-বেড়ালের সম্পর্ক দেখে ছেলেবেলা থেকেই। এদের ভিতরে তো কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এরা তো শহুরেদের মতো সেক্সস্টার্ভড় বা পার্ভার্স নয়। এরা ন্যুড দেখে সরলচিত্তে, রস পায় অনাবিল হৃদয়ে।

কী বলতে গিয়ে কী বলে বলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে এলুম! কিন্তু বিচক্ষণ গ্রাম্য পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন আমার এসব আশকথা-পাশকথা আমার মূল বক্তব্যের সখৎ বুনিয়াদ নির্মাণ করছে।

তা হলে ফিরে যাই ফের সেই ক্যাবারেতে; বরঞ্চ বলি, ততক্ষণে আমি সখাসহ নৃত্যশালা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমি প্যুরিটান নই, নটবরও নই। তাই এসব অশ্লীল ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে না। ঐ জর্মন পণ্ডিতের ভাষায় বলতে গেলে আমি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ স্বাভাবিক জনপ্রদপ্রাণী। তদুপরি আমি বুদ্ধু। আমি চট্ করে উত্তেজিত হই নে, ঝপ্ করে মাটির সঙ্গে মিলিয়েও যাই নে।

রাস্তায় নামার পর সখা বললে, "তা হলে চলো, পুরোপাক্কা উলঙ্গ নৃত্যে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! সে জায়গার টিকিটের মূল্য তো বিলেতের পঞ্চম জর্জের মুকুটের কূহ্-ই-নূরের চেয়ে খুব কিছু একটা কম হবে না। আমার পকেটে সে-রেস্ত নেই।"

www.pathagar.com

সখা জানতেন আমি বুদ্ধু। তাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "একদম নগ্ননৃত্যের আসরে টিকিটের দাম ঢের ঢের কম। ওগুলো বিলকুল পপুলার নয়।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, যেটি এ-লেখনে আমার একমাত্র বক্তব্য।

সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নৈসর্গিক নেচারেল জিনিস। সেটা দেখতে যাবে কে? প্যারিসে বেড়াতে আসে সাধারণত বিদেশীরা। তাদের অনেকেই মরবিড্, নপুংসক পার্ভার্স্। তারা, এবং অল্পাধিক ফরাসিরা যায় ঐসব অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যে। তারা তো নেচারেল নগ্ননৃত্য দেখতে চায় না। এইটেই আমার মূল বক্তব্য।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খোস্‌লা অতিষ্ঠ হয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সে-বিবৃতিতে তিনি একটা অশ্লীল ফিল্মের সাতিশয় ভর্ৎসনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। যুবক নায়ক যুবতী নায়িকা একটা টিলার সানুদেশে একে অন্যের অতিশয় পাশাপাশি লম্ববান হয়ে গড়্গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন এবং একে অন্যের প্রতি কুৎসিততম জঘন্যতম যৌনইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা কেন হল, তার বিশ্লেষণ শ্রীযুত খোস্‌লা করেন নি। বোধ হয় প্রয়োজনবোধ করেননি।

পাঠকদের সহৃদয় অনুমতি নিয়ে আমি তার বিশ্লেষণ করি।

যেহেতু এ-দেশের ফিল্মে চুম্বন, আলিঙ্গন, নগ্নতা দেখানো বেআইনি তাই ফিল্ম-নির্মাতা রগরগে ছবি বানিছেন যৌন-সম্পর্কের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে—হুবহু যে-রকম নগ্নাকে মোজা পরিয়ে, কাব্যের নৃত্যের শেষ কটিবস্ত্র উন্মোচন না করে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, চুম্বন নগ্নতার বাধা-নিষেধ যদি আজ তুলে দেওয়া হয় আর্টের খাতিরে (অবশ্যই সেটা কঠিন প্রশ্ন, ফিল্মে আর্ট বলতে আমরা কী বুঝি, এ নিয়ে সুযোগ পেলে পরবর্তীকালে আলোচনা করব), তবে কি আমাদের ফিল্ম-নির্মাতারা সঙ্গে সঙ্গে উদোম নৃত্য আরম্ভ করে তাঁদের ফিল্ম চুম্বনে নগ্নতায় ভরপুর, টৈটম্বুর করে দেবেন?

হয়তো গোড়ার দিকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরা শীগগিরই বুঝে যাবেন যে সাধারণ দর্শক তিন মিনিটব্যাপী চুম্বন, পাঁচ মিনিটব্যাপী নগ্নতা প্রদর্শন দেখবার জন্য অত্যধিক ব্যাকুল নয়। ঠিক যে-রকম পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্যারিসের পরিপূর্ণ নগ্ননৃত্য দেখবার জন্য মানুষ হৈ-হুল্লোড় লাগায় না। আইন দরকার, ব্যান্-এরও আয়োজন আছে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনো কোনো দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পরও সেসব দেশের খুনের সংখ্যা বেড়ে যায়নি।

হালে ডেনমার্কে সর্বপ্রকার অশ্লীল 'সাহিত্যের' উপরকার ব্যান্ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোথায় না অশ্লীল সাহিত্যের বিক্রি হুশ হুশ করে বেড়ে যাবে, রাম—ব্যাপারটা উল্টো বুঝেছেন। অশ্লীল মালের পাবলিশাররা মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাতে বসে গেছেন। তাঁদের বিক্রি শতকরা ৭০ ভাগ কমে গেছে। কারণ মানুষের লোভ নিষিদ্ধ ফলের প্রতি। ইংরিজিতে প্রবাদ : A stolen kiss is sweeter than any other.

www.pathagar.com

এ বাবদে শেষ আপ্তবাক্য বলেছেন একটি সুরসিকা ফরাসি মহিলা। আমেরিকায় তখন লরেন্স মহাশয়ের লেডি চ্যাটারলি পুস্তক অশ্লীল কি না, সেই নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। লেডি চ্যাটারলি পক্ষের উকিল ("লেডি চ্যাটারলির লাভার" না, "লেডি চ্যাটারলির লয়ার") হুতাশনসদৃশ প্রজ্বলিত ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করে অনুপ্রেরণিত কণ্ঠে বললেন, "লেখকরাজ লরেন্স এই পুস্তক দ্বারা যৌন-সম্পর্ককে অকল্পনীয় স্বর্গীয় স্তরে (স্পিরিচুয়াল লেভেলে) তুলে ধরেছেন।"

এই বিবৃতিটি পড়ে সেই ফরাসি মহিলাটি একটু দুষ্টুহাসি হেসে বললেন, "সর্বনাশ। এখন তা হলে যৌন-সম্পর্কের অর্ধেক আনন্দই মাঠে মারা গেল। আমি তো এ্যাদ্দিন জানতুম, এটা পাপাচার!"

www.pathagar.com

খোশগল্প

যখন-তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড় ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে বাচ্যা বাচলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না। নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।'

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুৎ) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানত, রাব্বী গল্প করতে ভারি ওস্তাদ। পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ করেছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিনগাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো! একফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার-মুখে স্বামীকে শুধাল, 'এ কী ছাগী আনলে গো?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানাপানি না পেলে আমিই-বা গল্প বলি কী করে?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেননি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপড়ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইক্ল্ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার কী? এসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ, অর্থাৎ এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা, সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, সেইরকম করে করে মোকামে পৌঁছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক— যা-কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পৌঁছে যাবেই যাবে মিষ্টি-সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য : 'লক্ষ' না বলে বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে; তার পর বলছে,)

www.pathagar.com

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য : 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পৌষে)

অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ, ছেলে-পিলে—'

(মন্তব্য : 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে-পিলে')

'পিলে, জ্বর, শর্দী, কাশী—'

(মন্তব্য : তার থেকে যাবতীয় তীর্থ!—)

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী—'

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যাস! পুরী তো খাদ্য,এবং ভালো খাদ্য। অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদবাকি উত্তম উত্তম আহারাদি! পৌঁছে গেল মোকামে!

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়।

ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদির কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যতরকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে যাবে। ঠিক সেইরকম আরো গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্ল এদেশে গোপালভাঁড় সাইক্লই বলা হয়। অর্থাৎ চালাকির যে-কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরেজীতে এটাকে 'ব্ল্যাঙ্কেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মতো চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কল্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলশাফ্‌টফেইষ নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশি, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন, দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্‌ ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধ করি শ্রীযুক্তা সীতা শান্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এঁর গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যান্ডে পল্‌ডি।

পল্‌ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছরে ধরে একখানা সুইস্‌ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্‌ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি :—

www.pathagar.com

বন্ধু : জানো পল্‌ডি অক্‌সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্‌ডি : তার আগে মানুষ বাঁচত কী করে?

কিংবা

পল্‌ডি : (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল্‌ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌ খানে?

টুরিস্ট : হাসপাতালে।

পল্‌ডি : সর্বনাশ! কী হয়েছিল আপনার?

কিংবা

বাড়িউলী : সে কি মি. পল্‌ডি? দশ টাকার মনিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বক্‌শিশ!

পল্‌ডি : হেঁ, হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে!

কিংবা

পল্‌ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন : ঘোড়াগুলো এরকম পাগল-পারা ছুটছে কেন?

বন্ধু : কী আশ্চর্য, পল্‌ডি তাও জানো না! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্‌ডি : তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন?

এর থেকে আপনি রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্‌ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, "কী ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া! আইলো সক্কলের পিছনে?"

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্‌ কী কত্তা! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের বাচ্চা—বেবাকগুলির খ্যাদাইয়া লইয়া গেল!'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গাড়োয়ান-গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্‌শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহুদেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মতো witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্‌চতুর) নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখিনি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিমবাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ী দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানিকে গিয়ে অনুযোগে জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে!' এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে এক বুড়ি তাতে একটুকরো ন্যাকড়া।

www.pathagar.com

দোকানিকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে?' এর ইংরিজি 'সংস্করণ' আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে একজোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মতো দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার।) দোকানিকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস্ আশা করেছিলেন!'

এবারে সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিসের এসাইকে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে—জল জল সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিসের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না, যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো দ্যান্ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবৎ পড়বে?'

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলল। আমি জানি এদের উইট, এদের রিপোর্ট লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পুব-বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

*　　　*　　　*

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য এ-প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্‌ল্ ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যেসব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা-পাকা সবকিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কী, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুৎসই করে যদি তাগ-মাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেরই মতো বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি বৈঠক-মজলিসে ছিলেন

www.pathagar.com

রাশভারী প্রকৃতির। গল্পবলার সময় কেউ কেউ অভিনয় যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কীভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধানবাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন-তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রির গরমে যখন ঘন্টাতিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া-রদ্দুরে, রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কী ব্যাপার? 'আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে এখনও ঘন্টাদুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।' আমি অবধূতকে শুধোলুম, 'আপনি কী করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি বেশি ঘ্যাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনি ফেরার। এখনো ব্যাপারটা হিল্যে হয় নি।

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারি নে। প্লট ভুলে যাই, কী দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম কী দিয়ে শেষ করব তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐয্যা, কী বলছিলুম' প্রতি দু'সেকেন্ড অন্তর অন্তর আসে, ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়াপরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে-গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশবার শুনে, জোড়াতাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছে। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়। আমি গল্পবলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

*　　　*　　　*

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সবচেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং

www.pathagar.com

পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যান্ডারিন সদস্য যে-গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কী হবে, চীনার কাঁচাভাষায় পাকা দাড়িওয়ালা ঐ গল্প তিনশ তেষট্টি বারের মতো শুনে। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সবকটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানিপড়ার বদলে শরবৎ পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কী রূপ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্ছনা'ও বলতে পারেন, একদম দা'ঠাকুরের পাইস হোটেল মেলের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ির এক পয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি না পড়ে শরবৎ পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নম্বর '১৯৮'!

সঙ্গে সঙ্গেই হো হো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে? শুনলে? কী রকম একখানা খাসগল্প ছাড়লে!' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

*　　　*　　　*

অতএব নিবেদন, এসব গল্প শিখে আর লাভ কী? এদেশেও কালে বিশ্বগল্পকথক-সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ-না-কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ৯৮ নম্বর বলতে-না-বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায়?

হ্যাঁ, অবশ্য, যতদিন-না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে থ্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যেরকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন বাড়িতে চপ-কাটলেট না-আসা পর্যন্ত লুচি-ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com